ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের দ্বাদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি সভায় কৃষি সমস্যার মূল কারণ এবং দরিদ্র চাষী ও খেতমজুরদের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে সবিস্তারে কমরেড ঘোষ দেখান কীভাবে ভারতের মত একটি পশ্চাৎপদ দেশে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী ভূমি-সম্পর্ক, কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ তথা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পথে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাঞ্জল, অন্তর্ভেদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি পরিষ্কারভাবে দেখান যে এই মৌলিক সমস্যার সমাধান ব্যতিরেকে কৃষি সমস্যার সমাধান ও গ্রামোন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। সাথে সাথে তিনি দেখান যে এদেশের স্বঘোষিত মার্কসবাদী দলগুলি যে ভূমিসংস্কারকে কৃষকের জীবনের যাবতীয় দুর্ভোগের উপশম বলে তুলে ধরে — কেবলমাত্র তার মাধ্যমে কৃষকদের সমস্যার নিরসন ও চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। পরিষ্কারভাবে তিনি দেখান যে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন ও তাদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান করার বিষয়টি পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার কর্তব্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৃত বিপ্লবী চাষী আন্দোলন গড়ে তোলার রাস্তা কী হবে — তার রূপরেখাটিও কমরেড ঘোষ এই ভাষণে তুলে ধরেন।

কমরেডস্,

কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের[১] তিনদিনব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে আমাকে কিছু বলতে আপনারা অনুরোধ করেছেন। আপনারা এই জেলার (বীরভূম) বিভিন্ন গ্রাম থেকে, থানা থেকে, অঞ্চল থেকে এবং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছেন। আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই একথা জানেন যে, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রতি একশো জনের মধ্যে পঁচাত্তর জনেরও বেশি এই গ্রামাঞ্চলগুলিতে বাস করেন। আর, এই গ্রামাঞ্চলগুলিতে যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ বাস করেন, তাঁদের হাজার এক রকমের সমস্যা। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে প্রথমেই একটা কথা বলে যেতে চাই, তা হচ্ছে, গ্রামীণ জীবনে এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে প্রতিটি সক্ষম চাষীর সারা বছর ধরে কাজ পাওয়ার সমস্যাই আজ প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। গরিব মানুষ জমি চাষ করেই হোক্, অথবা অন্য কোন ধরনের কাজ করেই হোক্, যাতে সারা বছর ধরে কাজ করতে পারে এবং কাজের মজুরি হিসাবে তার নিম্নতম আয় এমন হয়, যাতে সে একটা সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে, অর্থাৎ, মোটা কথায় সারা বছর খেয়ে পরে থাকতে পারে, ছেলেপিলেদের খাওয়াতে পারে, অসুখবিসুখ হলে ওষুধপত্র দিতে পারে এবং ন্যূনতম শিক্ষা ছেলেপিলেদের দিতে পারে — যা প্রত্যেকেরই দেওয়া উচিত — এইটাই গ্রামীণ জীবনে আজ মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনারা মনে রাখবেন, জোতদারদের দখলিকৃত বেনাম জমি উদ্ধার করে, সমস্ত পতিত জমি চাষোপযোগী করে এবং সরকারের হাতে ন্যস্ত জমি সমবণ্টনের নীতি অনুযায়ী খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করা আমাদের দেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ঠিকই, কিন্তু প্রধান সমস্যা নয়। কারণ, যে পরিমাণ জমি এক একটা পরিবারকে দিলে প্রতিটি পরিবারের সারা বছর খাওয়া-পরা এবং অন্যান্য খরচ চলে, গ্রামে যত লোক আজকে আছে, সেই জনসংখ্যাকে তেমন জমি দেওয়ার মতন জমির পরিমাণ ভারতবর্ষে নেই। ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র জমি বিলির কর্মসূচি কার্যকর করার মারফত গ্রামের সমস্ত খেতমজুর, গরিব চাষী ও ভূমিহীন চাষীর অভাব আমরা দূর করে ফেলতে পারি, বর্তমান গ্রামীণ সমস্যার রূপটি এরকম নয়। চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই কথাটি আপনাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

বেনাম জমি উদ্ধার করে এবং পতিত জমি চাষোপযোগী করে চাষীদের মধ্যে বিলি করা চাষী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

এর মানে এ নয় যে, বড় বড় জোতদাররা বা পুরনো জমিদাররা, যারা সিলিং-এর অধিক জমি বেনামে দখল করে রেখেছে, বা সরকারের হাতে যে সমস্ত খাস জমি ন্যস্ত রয়েছে, যার মধ্যে আবার অনেক জমি অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজসে নানান কারচুপি করে গরিব চাষী, ভূমিহীন চাষী এবং খেতমজুরদের ফাঁকি দিয়ে অন্য লোকেরা হাতিয়ে নিয়েছে, চাষী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে সেই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করে খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীর মধ্যে বিলি করার প্রয়োজনীয়তাকে আমার এ কথার দ্বারা আমি অস্বীকার করছি, বা তার গুরুত্বকে বিন্দুমাত্র লাঘব করে দেখাতে চাইছি। বরং আমি মনে করি, সরকারের হাতে যে খাস জমি ন্যস্ত রয়েছে, সেই সমস্ত জমি এবং বেনাম জমি পুনরুদ্ধার করে ও পতিত জমি চাষোপযোগী করে খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী এবং গরিব চাষীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া আপনাদের চাষী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, খাস জমি ও সমস্ত বেনাম জমি উদ্ধার করে এবং পতিত জমি চাষোপযোগী করে খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীর মধ্যে বিলি করে দিলেও ন্যূনতম যে পরিমাণ জমি দিলে একটি চাষী পরিবারের চলে, বেশিরভাগ চাষীকে সে পরিমাণ জমি আপনারা দিতে পারবেন না। কারণ, আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে একবার সারা ভারত সম্মেলনে আমরা হিসাব করে দেখেছিলাম, ন্যূনতম যে পরিমাণ জমি দিলে একটি চাষী পরিবারের চলতে পারে, যাকে আমরা 'ইকনমিক হোলডিং' বলি, তার পরিমাণ হল বারো বিঘা — যেটা বর্তমান ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে আজ গিয়ে দাঁড়াবে অন্ততপক্ষে পনেরো বিঘা। তা সেসব বাদই দিলাম। দেশে যত বেনাম জমি রয়েছে তা সব উদ্ধার করে, সমস্ত পতিত জমি চাষোপযোগী করে এবং খাস জমির সুষম পুনর্বণ্টন করে সারা ভারতবর্ষে যা জমির হিসাব, আর সারা ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিতে যত মানুষ রয়েছে — খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী এবং গরিব চাষীর যে সংখ্যা রয়েছে — তাতে সাত থেকে নয় বিঘা করে জমিও, যেটা আমার মতে আজকের দিনে ইকনমিক হোলডিং নয়, অর্ধেক মানুষকে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে বাকি অর্ধেক মানুষ তো জমিই পাবে না। ফলে জমি বিলি করার পরেও গ্রামে বহু লোক থেকে যাবে যারা বেকার, যাদের সারা বছর কাজ নেই এবং যাদের আপনারা জমিও দিতে পারেননি, অথচ কাজও তারা পাচ্ছে না। তখন কী হবে? তারা গ্রামে কাজ না পেলে বাড়ি-ঘর এবং গ্রাম পরিত্যাগ করে শহর এলাকায় যে করেই হোক্ উঠে যাবে। এইভাবেই গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে মজুরি করবার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা ভিক্ষুক হয়ে যাচ্ছে, না হয় কোনমতে যারা পারছে কুলিগিরি করে হোক্ বা যেভাবেই হোক্ রাস্তায় অমানুষের মত জীবনযাপন করছে। এর মধ্যে অনেকেই কিছুদিন পর আবার গ্রামে ফিরে আসছে এবং গ্রামীণ বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। ফলে শুধু জমি বিলির দ্বারা চাষী বাঁচবে না।

শুধু বেনাম জমি, খাস জমি উদ্ধার ও পতিত জমি চাষোপযোগী করে চাষীদের মধ্যে বিলি করলেই চাষীর সব সমস্যার সমাধান হবে না

আরেকভাবে বিচার করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন, উপযুক্ত পরিমাণ জমি চাষীদের মধ্যে বিলি করে দিলেও — খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ প্রথমত, জমি বিলির কর্মসূচি কার্যকর করার দ্বারা সমস্ত খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষী জমি পাবে না। দ্বিতীয়ত, জমি যারা পাবে তারাও জমি রাখতে পারবে না। কারণ আপনারা জানেন যে, সমাজে এবং প্রতিটি পরিবারে মানুষ বাড়ে কিন্তু জমি বাড়ে না। জমি যা আছে তাই থাকে। জমির পরিমাণের একটা সীমা আছে এবং ক্রমাগত জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোরও একটা সীমা আছে। কিন্তু প্রতিটি পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়ছে। ধরুন আপনি একজন চাষী। আপনি নয় বিঘা জমি পেলেন। আপনি ভাবলেন এতে আপনার চলে যাবে। তারপর আপনার পাঁচটি সন্তান হ'ল। আর যদি সরকারি হিসাব অনুযায়ী চলেন, তাহলে ধরা গেল অন্তত তিনটি সন্তান হ'ল। এখন আপনার এই জমি তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিন। আপনার তিনটি সন্তানের মধ্যে একজন কি দু'জন যদি মেয়েও হয় তাহলেও সমান সমান তিনভাগ হবে। কারণ আজকাল ভারতবর্ষে সম্পত্তির উপর নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক পরিবারের মেয়েরা পুরনো সংস্কার থেকে হয়তো আজও দাবি করে না। কিন্তু সচেতন হলে মেয়ে দাবি করবে। তাহলে নয়

বিঘা জমি তিনজনের মধ্যে সমান সমান ভাগ করে দিলে তিন বিঘা করে জমি এক একজনের ভাগে পড়বে। তারপর যদি সেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ হয় এবং তাদের আবার অন্তত তিনটি করে সন্তান হয়, তাহলে তো এক একজনের ভাগে এক বিঘা করে পড়বে। এই এক বিঘা করে জমি এক একটি পরিবারের থাকাও যা না থাকাও তাই।

দ্বিতীয়ত, গরিব চাষীর এক বিঘা করে জমি পাওয়ার কোন মানে হয় না। এমনকী, প্রতি পরিবার পিছু তিন বিঘা করে জমি বিলি করলেও তার কোন কার্যকারিতা দাঁড়াবে না। কারণ গরিব চাষীকে এই পরিমাণ জমি বিলি করে দিলেও পরের বছরই তাকে আবার এই জমি বিক্রি করে দিতে হবে। এই জমি সে রাখতে পারবে না। কারণ তিন বিঘা জমিতে একজন গরিব চাষীর সংসার চলবে না। ফলে যাদের পয়সা আছে, যারা জমি কেনে, তাদের কাছেই এই জমি বিক্রি হয়ে যাবে। এইভাবেই গরিব চাষী ও নিম্ন মধ্যচাষীর জমি হাতছাড়া হয়েছে। বিশ বছর আগেও গরিব চাষী ও নিম্ন মধ্যচাষীর হাতে যে জমি ছিল সেই জমি চলে গিয়েছে কী করে? আপনাদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক লোক তাঁরা জানেন যে, বাংলাদেশে পঞ্চাশ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষের সময় গরিব চাষী ও নিম্ন মধ্যচাষীরা বহু জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সেই সময়ে জোতদার ও মহাজনেরা গরিব চাষীর অভাবের সুযোগে সেই সমস্ত জমি জলের দামে ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। তাছাড়াও অভাবের তাড়নায় অথবা অসুখ-বিসুখে বা ক্রিয়াকর্মের সময় জমি বন্ধক রেখে যে টাকা চাষীরা নিয়েছে, ধার শোধ দিতে না পারার ফলে এবং সেই সমস্ত জমি আর উদ্ধার না করতে পারার ফলে বহু জমি তাদের হাতছাড়া হয়েছে। কাজেই দু'বিঘা কি তিন বিঘা জমি পেলেই কি চাষীদের জীবনের সমস্যার সমাধান হবে? না কি চাষী ও খেতমজুরদের আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে? একজন ভূমিহীন চাষী যে দু'তিন বিঘা জমি পেল, সেই জমি কি সে ধরে রাখতে পারবে? যদি তার ঘরের পাঁচটা ছেলের অন্য কাজের সংস্থান না থাকে এবং তার থেকে টাকা রোজগার করে সে জমি বাড়াতে না পারে এবং চাষবাস ঠিকমত চালাতে না পারে, তাহলে অভাবের তাড়নায়, অসুখ-বিসুখের সময়, ক্রিয়াকর্মের সময় আবার ঐ জমি সে বন্ধক রাখবে, অথবা বিক্রি করে দিয়ে আবার ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হবে। আমাদের মত পিছিয়ে-পড়া দেশের পুঁজিবাদী গ্রামীণ অর্থনীতির এই হ'ল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং এইভাবেই আমাদের দেশে দিনের পর দিন গ্রামে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুরের ক্রমবর্ধমান হারে সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে।

যদিও এ ব্যাপারে আমাদের দেশে অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে, আইন করে গরিব চাষীর জমি বিক্রি বন্ধ করে দিলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাঁরা একটা কথা ভেবে দেখছেন না যে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এরকম আইন করে জমি বিক্রি বন্ধ করে দিলে গরিব চাষীর কোন উপকার তো হবেই না উপরন্তু কৃষি উৎপাদনই মার খাবে। কারণ দু'বিঘা কি তিন বিঘা জমি একটি পরিবারের পক্ষে আন-ইকনমিক হোলডিং, অর্থাৎ অলাভজনক সম্পত্তি হওয়ার জন্য সেই জমি যেভাবে চাষ করা দরকার, চাষী সেভাবে কাজ করতে পারবে না। এমনকী সেই জমি অনেক সময় ফেলে রেখে দিতে বাধ্য হবে। ফলে এই অবস্থায় দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা দেবে, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া গোটা জাতীয় অর্থনীতির উপর বর্তাবে। ফলে জমি কেনাবেচা বন্ধ করা বর্তমান ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কারণেই সম্ভব হতে পারে না। যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশের অনুকরণে এরূপ অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকের জমি কেনা বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক সেই জমি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব অনেকে করে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্র সেই জমি কিনে নিয়ে কী করবে? সরকারকে তাহলে 'স্টেট ফারমিং' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে তুলে এই জমি চাষ করতে হবে। অথচ আজকের দিনে আমাদের মত একটি পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে সেই সমস্ত জমি কিনে নিয়ে বৃহৎ আকারে রাষ্ট্রীয় খামার তৈরি করে চাষ করাও সম্ভব হবে না। কারণ আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করতে গেলেই যে কোটি কোটি চাষী বেকারে পরিণত হবে তাদের কাজ দেওয়ার কোন উপায় থাকবে না। এমনিতেই শহরগুলি বেকারে, অর্ধবেকারে ভর্তি হয়ে আছে এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ফলে এই অবস্থায় কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করতে গেলেই, অর্থাৎ ট্র্যাক্টর-মেশিন নিয়ে কৃষিতে আধুনিকীকরণ ঘটাতে গেলেই এক ধাক্কায় গ্রামে কোটি কোটি লোক বেকার হয়ে যাবে। শহরের লক্ষ লক্ষ বেকারের সাথে কৃষিতে উদ্বৃত্ত কোটি কোটি বেকার যুক্ত হবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তার চাপেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। এমনিতেই যেখানে ক্রমাগত বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করছে, সেখানে পুঁজিবাদ তার নিজের বেঁচে থাকার তাগিদেই একাজ করতে পারে না। যে জমিটুকুর মধ্যে হাজার হাজার গ্রামের খেতমজুর, ভাগচাষী ও

গরিব চাষী আটকে রয়েছে, সেই জমিকে নির্ভর করে অর্ধমৃতের মতো হলেও কোনক্রমে জীবনযাপন করছে — ট্র্যাক্টর-মেশিনের সাহায্যে আধুনিক চাষবাস এখানে চালু করতে গেলে তারা বাড়তি হয়ে যাবে, 'সারপ্লাস' হয়ে যাবে। ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে চাষ শুরু হবার আগেই যে দেশে কাজ নেই বলে বেকার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের কলকারখানায় কাজ দেওয়া যাচ্ছে না, আবার যারা কলকারখানায় কাজ করছে তারাও ছাঁটাই ও লে-অফ্ হয়ে যাচ্ছে, বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে — এমনি যেখানে শিল্পের অবস্থা, এমনিতেই যেখানে কাজ নেই বলে গ্রামের লোক শহরে চলে আসছে, সেখানে ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ করতে গেলে পুঁজিবাদ আর নিজেকে সামাল দিয়ে উঠতে পারবে না। তাই এ দেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এই ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখার জন্য 'সবুজ বিপ্লব', 'জাপানি প্রথায় চাষ', 'তাই চুং', 'আই আর ৮' — প্রভৃতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নানারকম টোট্‌কার ব্যবস্থা করছে। খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যে কত রকমারি পরিকল্পনা করে কত রকম এবং কত বেশি ফসল ফলানো যায় তারই ভেল্‌কি দেখানোর নানা রকমের চেষ্টা চরিত্র চলছে এবং এরই পিছনে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে ব্যাপকভাবে 'বিগ্ ল্যান্ড ফারমিং' বা 'স্টেট ফারমিং' (বৃহৎ খামার বা রাষ্ট্রীয় খামার-এর) পরিকল্পনা নিয়ে কোনমতেই এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বজায় থাকতে এই রাস্তায় সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে আমাদের দেশের অসমাপ্ত কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচি সফল করার প্রশ্নটি আজ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

তাহলে এই আলোচনার দ্বারা আপনারা দেখতে পেলেন যে, শুধু জমি বিলির দ্বারা গ্রামীণ জীবনের দুর্গতি ঘোচানো যাবে না এবং চাষী বাঁচবে না, যদি গ্রামীণ গরিব চাষী পরিবারগুলির প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয়। উপযুক্ত পরিমাণে জমি বিলি করেই হোক্ অথবা অন্য কোন উপায়েই হোক্, এই কর্মসংস্থানই হচ্ছে গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যা। গ্রামের প্রতিটি মানুষের সারা বছর ধরে কাজ পাওয়ার উপায় এবং উপযুক্ত পরিমাণে মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা যদি থাকত, তাহলে অভাব এমন আকার ধারণ করত না। শিল্প-শ্রমিকদের কতকগুলি ক্ষেত্রে বর্তমান বুর্জোয়া সরকারও যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে, যেটাও আমার মতে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে হয়নি, হলে আজকের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির হিসাবে অনেক বেশি হওয়া উচিত — সেকথা না হয় বাদই দিলাম। যে পরিবারটির দু'বিঘেও জমি নেই, সেই পরিবারের প্রতিটি সক্ষম লোকের সারা বছর প্রতি মাসে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা বেতনের চাকরির ব্যবস্থাও যদি করা যেত তাহলেও সে এত অভাব বোধ করত না। অথচ একটি পরিবারের দশ-বারো বিঘা জমি থাকলেও, যদি ঘরে আট-দশটি লোক থাকে এবং তাদের আয়ের অন্য কোন সংস্থান না থাকে, তাহলে পরিবারের লোকদের চিকিৎসা, লেখাপড়ার কথা তো দূরে থাকুক, সারা বছর ভাল করে খাবার সংস্থানও তাদের হবে না। একথার মানে এই নয়, যেটা আমি আগেও বলেছি যে, যে জমি বেনাম রয়েছে বা খাস জমি যেগুলি ন্যায্যভাবে বিলি হয়নি অথবা যে সব পতিত জমি চাষোপযোগী করে তোলা হয়নি, সেই সমস্ত জমি উদ্ধার করে বিলি করার আন্দোলন আপনাদের করার প্রয়োজন নেই, বা তার গুরুত্ব চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে এতটুকু কম। তা করার প্রয়োজন আছে। কারণ তাতে খানিকটা দুঃখ-দারিদ্র্যের সুরাহা হবে এবং তার ফলে গ্রামীণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা খুব নগণ্য হলেও খানিকটা বাড়বে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এতে মূল সমস্যার সমাধান হবে না।

অবাধ শিল্পোদ্যোগের রাস্তা খুলে দিয়ে প্রতিটি সক্ষম গ্রামীণ লোকের সারা বছর ধরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যা

তাহলে, বেনাম জমি উদ্ধার করে চাষীদের মধ্যে বিলি করা, খাস জমি চাষীদের মধ্যে সুষমভাবে পুনর্বণ্টন করা এবং পতিত জমি চাষোপযোগী করে বিলি করা — চাষী আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ঠিক, কিন্তু চাষী আন্দোলনের মূল প্রাণকেন্দ্র এটা নয়। আজকের দিনে চাষী আন্দোলনের মূল প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে, কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণের পথে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটিয়ে এবং দেশের শিল্পবিকাশের রাস্তা খুলে দিয়ে গ্রামের বাড়তি জনসংখ্যা এবং সমস্ত গ্রামীণ বেকার এবং অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। অর্থাৎ বেনাম জমি উদ্ধার করে, পতিত জমি চাষোপযোগী করে এবং খাস জমির সুষম পুনর্বণ্টন করে খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীর মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিলি করার কার্যসূচি গ্রহণের দ্বারা উপযুক্ত

পরিমাণে জমি যাদের দেওয়া গেল তাদের দেবার পর, গ্রামে যাদের জমি দেওয়া গেল না সেই লোকগুলির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এখন প্রতিটি সক্ষম লোকের এই কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হবে কী করে? কে তাদের কাজ দেবে? এই কাজ সৃষ্টির একমাত্র উপায় হ'ল, লাগাতার শিল্পোদ্যোগ। দেশে যদি কলকারখানা এবং শিল্পের বিকাশ অপ্রতিহত গতিতে ঘটতে থাকে অর্থাৎ সর্বাত্মক শিল্পোদ্যোগের রাস্তা যদি দেশে খুলে দেওয়া যায়, তাহলে কৃষি অর্থনীতিতেও আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ করার জন্য প্রচেষ্টা চলবে। তখন কৃষি উৎপাদন দ্রুত বাড়াবার জন্য গ্রামীণ অঞ্চলেই কৃষি অর্থনীতির সহায়ক এবং তার পরিপূরক শিল্পগুলি গড়ে উঠতে থাকবে। ফলে কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিকীকরণের প্রয়োজনেই যে শিল্পগুলি গড়ে উঠবে, উপযুক্ত পরিমাণ জমি চাষীদের মধ্যে বিলি করার পর বাড়তি লোক যাদের জমি দেওয়া গেল না, তাদের একটা অংশ তাতে কাজ পাবে। তারপরেও যাদের কর্মসংস্থান হবে না, আশেপাশের শহরাঞ্চলে শিল্পোদ্যোগ যদি হতে থাকে, তারা সেখানে কাজ পেয়ে যাবে। এই অবস্থার সৃষ্টি হলে কোন পরিবারের সক্ষম লোক আর বেকার থাকবে না, প্রত্যেকেই কাজ পাবে। ফলে প্রতিটি পরিবারের জমি যতটুকু থাকবে তারা সেই জমিতে চাষ করবে, আর জমি থেকে সঙ্কুলান যা হবে না তার জন্য পরিবারের আর পাঁচটা ছেলে চাকরি-বাকরি করবে। এইভাবে সকলের কিছু না কিছু আয় হবে, চাষবাসের উন্নতি হবে, কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে, কৃষির উৎপাদন বাড়বে, গ্রামের চেহারা পালটে যাবে। গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে, রাস্তাঘাট হবে, স্কুল হবে, হাসপাতাল হবে, পার্ক হবে, খেলাধূলার বন্দোবস্ত হবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আর তা করতে পারলে এই যে বর্তমানে গ্রামের চেহারা, যাকে লোকে ভূতের আস্তানা বলে, যেখানে সাপ থাকে, ব্যাঙ থাকে, আর তার সাথে আপনারা থাকেন, তার চেহারাই বদলে যাবে। গ্রামগুলো মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হবে। গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের মধ্যে আজ যে আসমান-জমিন ফারাক রয়েছে সেটাও কমে আসবে। তাহলে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গ্রামগুলোকে মানুষ থাকার উপযুক্ত এই ধরনের উন্নত করে তৈরি করতে হলে কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণের জন্য দেশের শিল্পোন্নতি এবং প্রতিটি সক্ষম লোকের কর্মসংস্থানের সমস্যাটির সমাধান আপনাদের করতে হবে। আর আপনাদের মনে রাখতে হবে, এ সমস্যাটির সমাধানের জট জড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিজনিত যে সঙ্কট তার সমাধানের সাথে। বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আপনারা প্রবর্তন করতে না পারেন, তাহলে শুধুমাত্র জমি বিলির বর্তমান কর্মসূচি সফল করার দ্বারা দেশে অপ্রতিহত শিল্পবিকাশের রাস্তা আপনারা খুলে দিতে পারবেন না। আর তা না করতে পারলে প্রতিটি সক্ষম লোকের কর্মসংস্থানেরও কোন ব্যবস্থা হবে না, গ্রামের লোকের গরিবি ও দুঃখদুর্দশা ঘোচানো যাবে না এবং গ্রামগুলোর বর্তমান অবস্থারও কোন উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে না।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দেশের অপ্রতিহত শিল্পবিকাশের পথে আজ প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

পুঁজিবাদী-সম্পর্কের ভিত্তিতে ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে অর্থাৎ জমিতেই হোক্ আর কলকারখানাগুলিতেই হোক্, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন হচ্ছে বলে — যদিও জমিতে এতটা সমস্যা নয়, কিন্তু কলকারখানায় উৎপাদন বাড়তে পারছে না। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে কলকারখানায় শিল্পজাত দ্রব্য যা তৈরি হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকরা সর্বোচ্চ লাভের ভিত্তিতে তার যা দাম নির্ধারিত করে, আপনারা জানেন, সেই দামে কেনবার মত সামর্থ্য লোকের থাকলে তবেই একমাত্র সেই শিল্পজাত দ্রব্য মালিকরা বাজারে বিক্রয় করে। অথচ সেই দামে কেনবার মতো ক্ষমতা দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। কারণ প্রথমত, আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার যে পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ লোক গ্রামীণ অঞ্চলে জমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, সারা ভারতবর্ষের হিসাবে সেই লোকসংখ্যার শতকরা একান্ন থেকে পঞ্চান্ন ভাগই হচ্ছে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুর। এটা অত্যন্ত রক্ষণশীল হিসাব। আসলে এই সংখ্যাটা আরও বেশি। তাদের বেশিরভাগ অংশই বেকার এবং অর্ধবেকার, যাদের সারা বছর ধরে কাজের কোন সংস্থান নেই। আর গরিব চাষী অর্থাৎ যাদের দু'তিন বিঘা থেকে শুরু করে ছ'সাত বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা পনেরো ভাগ। এছাড়া নিম্ন-মধ্যচাষী, যাদের ছ'সাত বিঘা থেকে শুরু করে পনেরো বিঘা পর্যন্ত পরিবার পিছু জমি আছে তার সংখ্যাও হচ্ছে প্রায় পনেরো ভাগ। তাহলে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা এই

পঁচাশি ভাগ লোক হচ্ছে সর্বহারা এবং আধা-সর্বহারা — যাদের সারা বছরের কোন সংস্থানই নেই, খাওয়ার বন্দোবস্তই যারা করতে পারে না। গ্রামীণ জনসংখ্যার এই শতকরা পঁচাশি ভাগ লোকের কেনবার ক্ষমতা প্রায় শূন্য বললেই চলে। ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে জামাকাপড় জোগাড় করা, মা-বোনদের এক টুকরো কানি সংগ্রহ করা, আর দু'বেলা দু'মুঠো খাবার বন্দোবস্ত করতেই জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে তাদের। ফলে নানা ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজন হলেও তারা কিনবে কোথা থেকে? কেনবার ক্ষমতা তাদের কোথায়?

দ্বিতীয়ত, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শহরাঞ্চলেও যারা কলকারখানায় কাজ করছে, যারা মাস গেলে মাইনে পাচ্ছে, জিনিসপত্রের দামের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে তাদেরও প্রকৃত মজুরি পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। একথা ঠিক, অঙ্কের অর্থাৎ টাকার হিসাবে তাদের মজুরি আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যের অনুপাতে বিচার করলে তাদের সত্যিকারের আয় যে আগের থেকে অনেক কমেছে, চোখ কান বুজে না থাকলে বা মতলববাজ না হলে একথা অস্বীকার করার উপায় কারোরই নেই। আগে দৈনিক এক টাকা রোজগার করে যেভাবে দিন চলত, আজ তার চাইতে মজুরি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও লোকে ভাল আছে কি? না, নেই। কারণ মানুষের মতো বাঁচতে হলে যে যে উপকরণের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ জিনিসের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের দেশে একজন মজুরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হয় না। আমাদের দেশে একজন মজুরের ন্যূনতম মজুরি ততটুকু ধার্য করা হয়, যার দ্বারা একজন মজুর কোনমতে খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মালিকের মেশিনটি চালাতে পারে, একটা দুর্গন্ধময় বস্তিতে যেখানে মানুষ থাকলেই তার যক্ষ্মা হতে পারে সেইরকম জায়গায় কোনমতে একটা আস্তানা করে নিতে পারে, আর একটি মেয়েমানুষ বা বৌকে নিয়ে কোনমতে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারে। এইটুকু যে দামে একজন মজুর ব্যবস্থা করতে পারে সেইটাই তার নিম্নতম মজুরি হয়ে যায়। একটা জাতিকে গড়ে তুলতে হলে, একটা অতি সাধারণ পরিবারকে সুস্থ জীবনযাত্রার ব্যয় বহন করতে হলে, জিনিসপত্রের দামের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মজুরি যতটা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, কোন পুঁজিবাদী দেশেই সেই নিয়মে একজন মজুরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হয় না। আমাদের দেশের অবস্থা তো আরও খারাপ। ফলে প্রয়োজনমতো শিল্পজাত দ্রব্য কেনবার ক্ষমতা আমাদের দেশে কলকারখানায় কাজ করে যে মানুষগুলো, তাদের বেশিরভাগেরই নেই। এছাড়া যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারে শহরাঞ্চল ছেয়ে আছে এবং ক্রমাগত বর্ধিত হারে যে বেকার সংখ্যা বাড়ছে, তাদের তো কেনবার কোন ক্ষমতাই নেই।

এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই দেশের বেশিরভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকা এবং ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলে শিল্পপতিদের বাজার দেশের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিদিন তা আরও সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। অথচ শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে, শিল্পপতিদের দ্রব্য বিক্রয়ের তেমন অঢেল বাজার বিদেশেও আজ আর নেই। কারণ প্রথমত, পুরনো যে 'ট্র্যাডিশনাল' বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি এবং বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের পাশাপাশি বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বাজারের সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেই পুরনো ট্র্যাডিশনাল বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। উপরন্তু ভারতবর্ষের মতো যে সমস্ত দেশগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা কায়েম রেখে আগে একচ্ছত্রভাবে শোষণ করত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ও ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত এশিয়া-আফ্রিকার এই সমস্ত নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির নিজেদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারে আবির্ভাব, সঙ্কুচিত বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারকে ক্রমেই অধিকতর সঙ্কুচিত করে চলেছে এবং বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের সঙ্কটকে তীব্রতর করেছে। তৃতীয়ত, মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার যে সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, সেই সঙ্কটের চরিত্র ও রূপ পূর্বেকার বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের সমস্ত সঙ্কটের চাইতে মূলগতভাবে আলাদা। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে নানা সঙ্কটে পড়া সত্ত্বেও বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল। কিন্তু বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের বর্তমান সঙ্কটের রূপ এমন ধরনের যে, তার সেই আপেক্ষিক স্থায়িত্বও আজ আর নেই। আজ তা প্রতিদিনের এবেলা-ওবেলার সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। কাজেই আপনারা বুঝতে পারছেন, যেখানে সারা বিশ্বের বাজার একদিন পুঁজিবাদীদের আওতায় থাকা সত্ত্বেও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বাজার দখলের উদ্দেশ্যে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সম্পাদিত করেছে, সেখানে ভারতের মতো একটি পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশের

শিল্পপতিদের পক্ষে বর্তমানের চূড়ান্তভাবে সঙ্কুচিত বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে ইচ্ছামতো শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের অবস্থা বর্তমানে নেই।

আমাদের দেশের অসমাপ্ত কৃষিবিপ্লব সফল করার প্রশ্নটি
পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার সাথে আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে

ফলে এই যেখানে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের চেহারা, সেখানে ভারতীয় পুঁজিপতিদের পক্ষে ক্রমাগত বেশি বেশি করে উৎপাদন করা তো দূরের কথা, যে অল্প জিনিস শিল্পপতিরা তৈরি করে তারই 'বাজার' নেই। এই 'বাজার নেই' কথাটার অর্থ, আমি আগেই বলেছি, দেশের লোকের অভাব নেই, দেশের লোক কিনতে চায় না, তা নয়। দেশের বেশিরভাগ গরিব চাষী যে জামাকাপড় পরে থাকে, তাতে তাদের কি ভাল জামাকাপড় পরতে ইচ্ছা হয় না? তাদের ছেলেপুলেদের ভাল জামাকাপড় পরাতে ইচ্ছা হয় না? ভাল খাবারদাবার দিতে ইচ্ছা হয় না? পাশেই একজন রসগোল্লা খাচ্ছে দেখে একজন গরিব চাষীর কি রসগোল্লা খেতে ইচ্ছা করে না? তার বাচ্চাটাকে খাওয়াতে ইচ্ছা করে না? করে। কিন্তু করলে কী হবে, তাদের সে ক্ষমতা কই? তাদের এই অক্ষমতার জ্বালা ভোলবার জন্য তারা অদৃষ্টের দোহাই দেয়, ধর্মের দোহাই দেয়, না হয় আবোল-তাবোল বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। আর না হয় চিনির ডেলা দিয়ে, অথবা গুড়ের ডেলা দিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। তাদের ভাল জিনিস কেনবার মতো ক্ষমতা কোথায়? এরূপ অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে বাজার সম্প্রসারণ ঘটবে কী করে এবং অব্যাহত গতিতে শিল্পের বিকাশ হবে কী করে? নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠবে কী করে? বরং বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠা দূরের কথা, পুঁজিপতিদের বাজার সঙ্কটের ফলে চালু কলকারখানাগুলিও একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় পিছিয়ে-পড়া দেশ হিসাবে আমাদের যেখানে নিত্য নতুন উদ্যমে শিল্পোদ্যোগ করা প্রয়োজন, সেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য আমাদের দেশে যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, অর্থাৎ এককথায় যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, সেই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অপ্রতিহত গতিতে শিল্পবিকাশের পথে আজ প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং পিছিয়ে-পড়া দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিল্পে সঙ্কট ডেকে আনছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই বাধাটি হটাতে না পারলে অপ্রতিহত গতিতে আমরা শিল্পবিকাশের দরজা খুলে দিতে পারব না। আর তা না পারলে, কৃষিবিপ্লবের অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করা অর্থাৎ কৃষির আধুনিকীকরণ ও কৃষিতে যন্ত্রীকরণ এবং গ্রামের সমস্ত মানুষের সারা বছর ধরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব না।

তাহলে গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যার সমাধান করতে হলে, শিল্পের বিকাশকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য পরিচালিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ এককথায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী সরকার হটিয়ে মজুর-চাষীর রাজত্ব কায়েম করতে হবে এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে এ কাজটি করতে হলে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আপনাদের সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এমন সমস্ত দলের মধ্যে আমাদের দল এস ইউ সি আই ছাড়া খোলাখুলি ভাষায় পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কথা সি পি আই (এম)ও বলছে না, সি পি আইও বলছে না। তারা বলছে, ভারতবর্ষের শোষিত মানুষ অর্থাৎ মজুর-কিষান-নিম্নমধ্যবিত্তের মূল লড়াই হচ্ছে একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। এখন দেখা যাক্, ভারতবর্ষের মতো একটা পুঁজিবাদী দেশে একচেটে পুঁজিবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী লড়াইয়ের আসল অর্থটি কী।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, যেখানে শোষণ হচ্ছে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য, সেখানে যারা গোটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা না বলে সমস্ত পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের দায়দায়িত্বটা গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, তারা আসলে পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্রটাকেই আড়াল করতে চাইছে। কারণ একচেটে পুঁজিবাদ তো পুঁজিবাদেরই একটা রূপ। ফলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কর্মসূচি যদি তাদের না থাকে, তাহলে একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইটাও তাদের একটা ফাঁকা স্লোগান, মিথ্যা স্লোগানে দাঁড়িয়ে যায়। একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে বক্তৃতা তো ইন্দিরা গান্ধীও দেন।

ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসও একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলে। তারাও গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীর অপকর্মের দায়দায়িত্বটা গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীকেই জনসাধারণের কোপ থেকে আড়াল করতে চাইছে। ফলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামেই হোক্, আর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামেই হোক্ মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই যদি কেউ বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণের দায়দায়িত্বটা গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গোটা পুঁজিপতিশ্রেণীকেই আড়াল করতে চায়, তাহলে তাদের আসল মতলবও তো ইন্দিরার মতোই।

দ্বিতীয়ত, এই দু'টি দলের সামন্ততন্ত্রবিরোধী লড়াইয়ের স্লোগানটিও যে একটি ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয় সেটাও একটু বিচার করে দেখলেই ধরা পড়বে। আমাদের দেশে পুঁজিবাদ যে অবস্থাতেই থাকুক, যত পিছিয়ে-পড়া অবস্থাতেই থাকুক, এখানে পুঁজির শোষণই যে প্রধান, এখানে কৃষি অর্থনীতির সাথে যুক্ত মানুষগুলোর ওপর শোষণও যে পুঁজির শোষণ — সেটা আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে। কিন্তু এই দলগুলির ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি যুক্তির খাতিরে আপাতত ধরেও নিই যে, আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্র টিকে আছে, তাহলেও তো লেনিনবাদের ছাত্রমাত্রেরই জানার কথা যে, যে মুহূর্তে আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, সেই মুহূর্তেই ভারতবর্ষ একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদই হ'ল বিপ্লবের মূল লক্ষ্য — কৃষি অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্র যাই থাকুক না কেন।

আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি

এখন দেখা যাক, আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতির ধাঁচাটির রূপ কী? আগের আলোচনাতেই আমরা দেখেছি, আমাদের দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষ সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে এসেছে, যাদের হাত থেকে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে অথবা ক্রমশঃই যাচ্ছে। এখন এই জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পন্ন মধ্যচাষী অর্থাৎ পনেরোর উপর থেকে পঞ্চাশ-ষাট বিঘার মালিক যারা, যাদের সংখ্যা শতকরা দশ-এগারো ভাগ, সেই সংখ্যাটা যোগ দিলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ জনসংখ্যার বাকি মাত্র পাঁচ থেকে ছয় ভাগ লোকের হাতে দেশের মোট জমির পঞ্চান্ন থেকে ষাট শতাংশ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এই যে একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের অধিকাংশ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে এবং অন্যদিকে গ্রামের অধিকাংশ লোক অর্থাৎ গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি ভাগ লোক গ্রামীণ সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে এসেছে — এটা হচ্ছে কীসের জন্য? অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞানও যাঁদের আছে তাঁরাই বুঝবেন, এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অমোঘ নিয়মেই।

দ্বিতীয়ত, আপনাদের বুঝতে হবে এবং সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে যে, আপনাদের উপর এই যে শোষণ এবং জুলুম চলছে, এর মূল কারণ হ'ল ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে শহরের কলকারখানাতেই হোক্, আর গ্রামের জমিতেই হোক্ — সর্বত্রই পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হচ্ছে। শহরে কলকারখানায় আমাদের দেশে যে উৎপাদন হচ্ছে, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্র যে মালিক-মজুর সম্পর্কের চরিত্র, সেটা সহজেই সকলে বুঝতে পারেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও আমাদের দেশে উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্র মূলত মালিক-মজুর সম্পর্কের চরিত্র। যদিও গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই মালিক-মজুর সম্পর্কের রূপ পিছিয়ে-পড়া দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের এক এক প্রান্তে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এক একরকম, তাহলেও এর মূল চরিত্র বর্তমানে সর্বত্রই মালিক-মজুরের চরিত্র। কেউ মাস মাইনের ভিত্তিতে মজুর, আবার কেউ প্রাত্যহিক রোজের ভিত্তিতে মজুর। হয়তো কোথাও কোথাও দেখা যাবে, এই খেতমজুরদের একটা অংশ আবার এক থেকে তিন বিঘা পর্যন্ত জমিরও মালিক। কিন্তু তারা মজুর। কেউ মজুরির খানিকটা টাকার অঙ্কে পায়, খানিকটা খাদ্য পায়। কেউ কেউ আবার টাকার অঙ্কে মজুরির বদলে ফসলের ভাগ পায়। আমাদের দেশের এই ধরনের মজুরদের আমরা ভাগচাষী বলে থাকি — যাদের মধ্যে কারোর কারোর হয়তো দু'এক বিঘা করে জমিও থাকে। কিন্তু এ সমস্তগুলিই আজকের দিনের একটি পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মালিক-মজুর সম্পর্কেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কারণ এরা সকলেই অপরের জমিতে মজুরি করে। আর এই যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিক-মজুর সম্পর্ক, একেই বলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক।

আর একদিক থেকে বিচার করলেও আপনারা দেখতে পাবেন, আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতিতে

পুঁজিবাদী-সম্পর্কের ভিত্তিতেই উৎপাদন হচ্ছে। পুঁজিবাদ কাকে বলে? পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হ'ল জমিতে হোক্, কলকারখানায় হোক্, পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজি বৃদ্ধি ঘটানো অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজি বৃদ্ধি করা উৎপাদনের মারফত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতিরা কলে-কারখানায় মাল তৈরি করে। তারপর সেই মাল বাজারে বিক্রি করে যে পুঁজি বিনিয়োগ করে তার বেশি লাভ নিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। এই লাভ তারা সংগ্রহ করে মজুরকে শোষণ করে, মজুরের শ্রমশক্তিকে শোষণ করে, তার ন্যায্য মজুরি ফাঁকি দিয়ে। একেই আমরা বলি পুঁজিবাদ। এবার দেখা যাক্ আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারাটা কী। আজ গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারা কি এইরকম যে, জমির মালিক যারা, তারা সামন্তী ব্যবস্থার মতো মূলত নিজেদের ভোগের জন্য জমিতে ফসল ফলায় এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য তার থেকেই একটা অংশ স্থানীয় বাজারের নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় বাজারেই বিক্রি করে? না কি, জাতীয় বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে জমির মালিকরা জমিতে উৎপাদন করে? উপরন্তু আজ কি গ্রামে উৎপাদিত ফসলের দাম স্থানীয় বাজারের নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হচ্ছে? না কি, কৃষিজাত পণ্য আজ জাতীয় বাজারের পণ্যে পর্যবসিত হয়েছে? রেডিও খুললেই শুনতে পাবেন, চাষবাসের সমস্ত ফসল আজ 'শেয়ার মার্কেট', 'হোলসেল মার্কেট', আর 'স্টক এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল' করছে। তাদের নির্ধারিত দর অনুযায়ী জমির মালিকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করছে এবং বিক্রি করে পুঁজির অঙ্ক বাড়াচ্ছে। তাহলে জমিও কারখানার মতোই আজ পুঁজি বিনিয়োগের একটা উপায়, একটা যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজি বাড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া, আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে, জমিতেও মালিকরা পুঁজি বিনিয়োগ করে যে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করছে, সেটাও করছে তারা মালিক-মজুর অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতেই — স্থান-কাল-পাত্র ভেদে রূপ তার যাই হোক্ না কেন।

তাহলে এই যে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের বেশিরভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়া, গ্রামের বেশিরভাগ লোকের ক্রমাগত সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে আসা, জমি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে রূপান্তরিত হওয়া, মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হওয়া এবং সর্বোপরি কৃষি উৎপাদনের জাতীয় বাজারের পণ্যে পর্যবসিত হওয়া — এই সবগুলিই প্রমাণ করে, ভারতের কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ভারতীয় পুঁজিবাদ যতই পিছিয়ে-পড়া এবং অনুন্নত হোক্ না কেন, দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ও গ্রামীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাস, আচার-আচরণ প্রভৃতির জের টেনে চলা ছাড়া ভূমি-সম্পর্ক ও কৃষি উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক কোথাও নেই। পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদন-সম্পর্ক তার জায়গা দখল করেছে — দেশ-কালের প্রভেদের জন্য রূপ তার যাই হোক্ না কেন, এবং কৃষিজাত পণ্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যও পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশে মেশিন-ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ হচ্ছে না বলে অথবা ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে এবং গ্রামীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক পুরনো অভ্যাস ও আচার-আচরণের অবশেষগুলি দেখে যারা আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি — এটাই অস্বীকার করতে চাইছে, তারা সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এই বর্তমান যুগে একটি পিছিয়ে-পড়া দেশে পুঁজিবাদ কীভাবে কৃষি অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করে, সে সম্পর্কেই তাদের চূড়ান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন পুঁজিবাদ প্রগতিশীল ছিল, যখন আর্ন্তজাতিক বিপ্লবটা পুঁজিবাদী বিপ্লব ছিল, যখন পুঁজিবাদ একদিকে ধর্ম এবং অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে এগোচ্ছিল, যখন পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতে হলেও উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটছিল এবং ব্যাপক শিল্পবিকাশ ঘটছিল, তখন শিল্প গড়ে তোলার পরিপূরক হিসাবে তার কাঁচামাল জোগান দেওয়া, আর গ্রাম থেকে বেশিরভাগ লোক সারপ্লাস অর্থাৎ বাড়তি করে দিয়ে শিল্পগুলিতে কাজ করাবার জন্য কৃষিতে পুঁজিবাদ ঢুকেছিল মেশিন-ট্র্যাক্টর নিয়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে যখন পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল, শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদ তার তৃতীয় তীব্র বিশ্ব বাজার সঙ্কটের সম্মুখীন, যখন নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, বাজারের অভাবে পুরনো শিল্পগুলিরও উৎপাদন কমে যাচ্ছে অথবা একেবারে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে — ফলে বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে দেখা দিচ্ছে, তখন পুঁজিবাদ তার নিজের স্বার্থেই মেশিন-ট্র্যাক্টর দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ ঘটাতে পারছে না।

পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদের স্বার্থেই ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ করতে পারছে না বলেই

আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয় — এ কথা বলা চলে না। পিছিয়ে-পড়া বা অনগ্রসর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে ভেঙেই। কিন্তু পুঁজিবাদ তার নিজের স্বার্থেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে জমিতে আজ আটকে রাখতে চাইছে যাতে বেকার সমস্যা এমন আকার ধারণ না করে যার ফলে বেকার সমস্যার চাপেই ভেঙে পড়ে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক গ্রামে যদি এক ধাক্কায় বেকার হয়ে যায় তাহলে এই বিশালাকার বেকারবাহিনী বারুদের মত ফেটে পড়বে শহরে-গ্রামে, যাকে সামাল দেওয়া কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আর আমাদের দেশের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পবিকাশের পরিপূরক হিসাবে কৃষিব্যবস্থার পুরোপুরি আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ করা সম্ভব নয়। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিতেই অধিকাংশ লোককে অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় আটকে রাখার পুঁজিবাদী চক্রান্ত চলছে। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর দল কংগ্রেসের ভূমিসংস্কারের কার্যক্রম এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্‌গাতাদের ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম এই চক্রান্তেরই নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, আপনাদের মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এই যুগে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, সেইসময় আমাদের দেশের পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে বলে এখানে পুঁজিবাদ ধর্ম এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আপসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। আর এরই ফলে কৃষি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশ পিছিয়ে-পড়া দেশ বলে পুঁজিবাদী মূল সম্পর্ক এবং শোষণের মধ্যে এখানে সামন্তী অভ্যাস ও আচার-আচরণের নানান জিনিস খাদ হয়ে মিশে আছে, যেমন সোনার মধ্যে খাদ মিশে থাকে। এই অবস্থায় আঘাতটা আমরা কাকে করব? খাদটাকে? না, পুঁজিবাদ — যেটা শোষণের মূল কারণ তাকে? যারা এক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের কথা না বলে সামন্তী প্রথা যতটুকু এই পুঁজিবাদী শোষণের মধ্যে পিছিয়ে-পড়া দেশ হিসাবে খাদ হয়ে মিশে আছে তাকেই আঘাত করার কথা বলে, তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে যত বক্তৃতাই করুক না কেন আসলে পুঁজিবাদী শোষণের পক্ষেই ওকালতি করে। একথাটা আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আপনাদের বুঝতে হবে, মজুর-চাষী-নিম্নমধ্যবিত্তের বিপ্লবী আন্দোলনের মূল শত্রু হচ্ছে আমাদের দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী, যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। ঠিক এই জায়গাটিতেই যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, এখানে যারা ভুল বোঝায়, এখানে যারা ছোটখাট ঘটনাগুলিকে এবং তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সামনে তুলে ধরে আসল সত্যকে চাপা দিয়ে মূল শ্রেণীশত্রু থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায়, তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও তারা জনতার সর্বনাশ করে।

তাহলে সমস্ত দিক থেকে আলোচনা করেই আমরা দেখলাম, চাষী জীবনের প্রধান দু'টি সমস্যার একটি হচ্ছে জমি উদ্ধার করে জমি বিলি করার পরও গ্রামে যে বাড়তি জনসংখ্যা থেকে যাবে, যাদের জমি দেওয়া যাবে না এবং যে বাড়তি জনসংখ্যা প্রতিদিন গড়ে উঠবে, গ্রামে সেই বাড়তি জনসংখ্যার উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং আর একটি হচ্ছে কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ। আর, এ দু'টি মূল সমস্যারই সমাধান জড়িয়ে রয়েছে শিল্পবিপ্লব এবং শিল্পের অবাধ অগ্রগতির দ্বার খুলে দেওয়ার মধ্যে। আর অবাধ শিল্পবিকাশের দ্বার আমরা তখনই খুলে দিতে পারি, যখন পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করে দিতে পারি।

কিন্তু যদি দেখা যায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এমন কোন দলও তাদের ভূমি-সংস্কার নীতিতে চাষীর হাতে জমি বিলিকেই মূল ও একমাত্র কর্মসূচি বলে গ্রহণ করছে, তাহলে তো বুঝতে হবে যে তারাও একটু ভিন্ন প্রকারে, ভিন্ন কথায় গ্রামের বেশিরভাগ মানুষগুলোকে ঐ তিন বিঘা, দেড় বিঘা জমিতে আদিম অসভ্য মানুষের মত গ্রামীণ অর্থনীতিতেই অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় আটকে রাখতে চায়। অথচ একাজ হচ্ছে যারা পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখতে চায় সেই সমস্ত পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক দালালদের, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কৃষির উন্নতি চাইবে, কৃষির আধুনিকীকরণ চাইবে, যন্ত্রীকরণ চাইবে। তার জন্য সমস্ত পুরনো ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থাকে ভাঙতে চাইবে। এই ভাঙার জন্য পুঁজিবাদ বাধা বলে পুঁজিবাদকে হটাবে। তারা চাষীর হাতে জমি দেওয়ার স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের স্লোগানও তুলবে। যখন শুনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও বলে যে, বেকার বাড়বে, কাজেই মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু বন্ধ কর — তখন আমার সত্যই অবাক লাগে। অনেকের প্রোগ্রামে দেখছি যে, চাষী আন্দোলনে তাদের কর্মসূচি হচ্ছে মেশিন-ট্র্যাক্টরকে রোখ এবং এই মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রচলন রোখার আন্দোলনকে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত কর।[৩] অদ্ভুত স্ববিরোধী কথা! আমার মাথায়ই ঢোকে না। মেশিন-ট্র্যাক্টর বিরোধী

আন্দোলনকে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে যাব কেন? মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করলেই তো গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটবে। তাই তো হয়। সামন্ততন্ত্রের জন্য মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রয়োগ করা আটকাচ্ছে না কি? এতো সেই বুর্জোয়াদেরই মেশিন-ট্র্যাক্টরকে রোখার পরিকল্পনা, পুঁজিবাদকে তার বেকার সমস্যার চাপ থেকে বাঁচাবার বুর্জোয়া রাজনীতি বা ভূমিসংস্কারের পরিকল্পনারই অনুরূপ একটা জিনিস। কোথাও গ্রামে চাষী আন্দোলন করতে গিয়ে বাস্তবে মেশিন-ট্র্যাক্টর আসার ফলে লোকগুলো বেকার হয়ে যাচ্ছে — এই অবস্থায় তাদের সংগঠিত করে আন্দোলনে যখন নিয়ে যাব, তখনও তো এই কথাটাই আমি তাদের বোঝাবো যে, জনসাধারণ মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে নয়। চাষী মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনই চায়। তা নাহলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হবে কী করে? গ্রামীণ জীবনের উন্নতি হবে কী করে? খেতমজুর এবং গরিব চাষীর দুর্দশা ঘুচবে কী করে? বাজার সম্প্রসারণ হবে কী করে? শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলবে কী করে? শিল্পের জন্য কৃষিপণ্য বা কাঁচামাল উৎপাদন সম্ভব হবে কী করে? দেশের খাদ্য সমস্যা দূর হবে কী করে?

কাজেই প্রগতির জন্য, খেতমজুর ও চাষীর জীবনের দুর্দশা ও গ্রামীণ জীবনের অন্ধকার ঘোচানোর জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ প্রয়োজন। কিন্তু আজকের দিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা করা যায় না। করতে গেলে খেতমজুর ও গরিব চাষীদের একটা বিরাট অংশ এক ধাক্কায় বেকার হয়ে যাবে। তাদের খাওয়ার সংস্থান যতটুকু আছে তাও থাকবে না। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার আগে এ কাজে হাত দেওয়া যায় না। অথচ কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ ব্যতিরেকে গ্রামীণ জীবনের বর্তমান দুর্দশা ও অন্ধকার ঘোচানোও সম্ভব নয়। কাজেই বাঁচার তাগিদে এবং গ্রামীণ জীবনের উন্নতির জন্যই গ্রামের খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী, গরিব চাষী ও নিম্নমধ্য চাষী — সকলকে আজ একজোট হয়ে শহরের সর্বহারা ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের সাথে মিলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কাজে আর কালবিলম্ব না করে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাই পুঁজিবাদকে পাল্টাবার জন্য তাদের তৈরি হতে হবে এবং যতক্ষণ পুঁজিবাদকে পাল্টাতে না পারছে, ততক্ষণ মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের ব্যাপারে তাদের সঠিক স্লোগান হওয়া উচিত — হয় বিকল্প কাজ দাও, না হয় মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করতে দেব না। আমরা খেতমজুর এবং চাষীরা কৃষির আধুনিকীকরণ চাই এবং মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করতেই চাই, আর সেই প্রয়োজনেই আমরা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে চাই। কারণ, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করলেই শিল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত হবে, কৃষির আধুনিকীকরণ এবং যন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে, গ্রামীণ জীবনের সার্বিক উন্নতির রাস্তা খুলে দেওয়া যাবে, এবং গ্রামীণ জীবনের বর্তমানের চেহারা পাল্টে দেওয়া সম্ভব হবে।

এই সমস্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের দেশের অসমাপ্ত কৃষিবিপ্লব সফল করার প্রশ্নটি অর্থাৎ কৃষির আধুনিকীকরণ এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানো এবং জমিতে বাড়তি জনসংখ্যার স্থায়ী কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি আজ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই, এই যেখানে প্রকৃত সমস্যা, সেখানে যারা আমাদের দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ না করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান আওড়াচ্ছে এবং কতকগুলো গরম গরম বিপ্লবের স্লোগানে চাষীদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে, তারা আসলে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই কতকগুলো সংস্কারের জন্য লড়ছে এবং তাদের এই কাজের দ্বারা পরোক্ষভাবে হলেও বর্তমান পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাকেই তারা শক্তিশালী হতে সাহায্য করছে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি — যা বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুলিশ দিয়ে, আইন দিয়ে, মিলিটারি দিয়ে রক্ষা করছে এবং চালু রেখেছে, বিপ্লবের আঘাতে তাকে হটিতে দিয়ে তার পরিবর্তে যদি আপনারা নিজেদের পুলিশ-মিলিটারি, আইন-আদালত অর্থাৎ নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন, তাহলে আপনাদের মতন করে শিল্পোদ্যোগ আপনারা করতে পারবেন না এবং গ্রামের চেহারাও পাল্টাতে পারবেন না। চাষী জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির কোন সমাধান হবে না। এটাই হচ্ছে চাষীর মুক্তি আন্দোলনের সামনে বর্তমানে প্রধান সমস্যা।

প্রতিক্রিয়াশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা পরিত্যাগ করে চাষী কর্মীদের বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা করতে হবে

পুঁজিবাদবিরোধী এই বিপ্লব যা সম্পন্ন করার বিরাট দায়িত্ব আপনাদের ওপরে ন্যস্ত, তা করতে হলে আপনাদের কতকগুলো জিনিস প্রথমে ভাল করে বুঝে নিতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, যদি চিন্তাভাবনার

দিক থেকে পুরনো সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার শিকার আপনারা হয়ে থাকেন, তাহলে এই মহান বিপ্লব আপনারা সফল করতে পারবেন না। অথচ লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনাদের অনেকের মধ্যে সেই মানসিকতা আজও কিছু কিছু কাজ করে চলেছে। যেমন আপনাদের বেশিরভাগ লোকের মানসিকতা হচ্ছে, যখন অভাব আসে, যখন কোনমতেই চলে না, যখন মহাজনের সুদ দিতে পারেন না, তখন আপনারা সংগঠিত হন, প্রতিবাদ করেন। কিন্তু যখন সেই আশু দাবি মিটে যায় তখন আপনারা মনে করেন আপনাদের মোক্ষ লাভ হয়ে গেল। আপনারা মনে করেন, সংগঠন করে লড়ে-টড়ে, যে করেই হোক্ আপনারা মহাজনের সুদ ফাঁকি দিয়ে দিয়েছেন। আপনারা একথা কিছুতেই মনে করতে পারেন না যে, সুদ আপনারা ফাঁকি দেননি। কারণ সুদ নেওয়ার অধিকারই মহাজনের নেই। আপনারা এভাবে ভাবেনই না যে, সুদ নিয়ে মহাজন অন্যায় করছিল, আপনারা লড়াই করে তা রুখে দিয়েছেন। আপনারা বরং ভাবেন, আপনারা সুদ ফাঁকি দিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের মনের মধ্যে রয়েছে আপনাদের শত্রু কু-ধর্মবুদ্ধি, যা মালিকরা আপনাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে আপনাদের সর্বনাশ করে। ওরা আপনাদের বলে, 'তোরা ঈশ্বর মানিস্ তো? তাহলে এটা কি তোদের ধর্ম হ'ল যে, তোরা যে টাকা নিয়েছিস তার সুদটা দিবি না?' আর আপনারাও মাথা নাড়েন। তা আমি বলি, ধর্মবোধ কি শুধু সুদ নেবার সময়? ধর্মের কি অন্য কোন কাজ নেই? তা যদি না থাকে তাহলে তো সেই ধর্মের বিদায় হওয়াই ভাল। মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করা, অন্যায় বন্ধ করা, পুলিশের অত্যাচার বন্ধ করা, মানুষের কাজের বন্দোবস্ত করে দেওয়া — এসব ব্যাপারে যদি ধর্মের কিছু না করার থাকে, তাহলে তো সে ধর্মের বিদায় হওয়াই উচিত। যে ধর্মবোধ সুদ দিতে শেখায়, সে ধর্ম তো সর্বনাশ করে। তা এই ধরনের সব ধর্মবুদ্ধি আপনাদের মধ্যে রয়েছে। এই ধর্মবুদ্ধি আপনাদের মধ্যে থাকলে বিপ্লব আপনারা করতে পারবেন না। এইসব ধর্মবুদ্ধি আর বিপ্লব একসঙ্গে চলতে পারে না। যাঁরা পরাধীনতার থেকে মুক্তি অর্জন করতে চান, গ্রামের চেহারা পাল্টে দিতে চান, পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টাতে চান, তাঁরা যদি এই ধরনের কূপমণ্ডুক হয়ে থাকেন, শাস্ত্র, কু-আচার, কুসংস্কারের শিকার হয়ে থাকেন, তাঁদের দ্বারা কি বিপ্লব করা সম্ভব? তাঁদের দ্বারা কি পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব? আপনারা মনে রাখবেন, এতবড় একটা জবরদস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে পরাস্ত করে নিজেদের রাষ্ট্র, নিজেদের পুলিশবাহিনী, নিজেদের বিচার বিভাগ, নিজেদের কর্তৃত্বে দেশের কলকারখানা, চাষবাস সমস্ত কিছু পরিচালনা করার ক্ষমতা সেই সমস্ত মজুর-চাষীরই আছে, যে সমস্ত মজুর-চাষী কু-সংস্কার থেকে মুক্ত, যারা এই সব ধর্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত, যে সমস্ত চাষী সৎ, যাদের লড়াইয়ের মনোভাব, সৎ সাহস এবং আত্মাহুতি দেবার ক্ষমতা আছে; যে সমস্ত চাষী বোঝে যে, তাদের যদি মানুষের মতো বাঁচতে হয়, তাদের সন্তান-সন্ততিদের যদি মানুষের মতো বাঁচবার রাস্তা করে দিতে হয়, তাহলে তাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এই মানসিকতা আয়ত্ত করতে হলে আপনাদের বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা করতে হবে।

গ্রামীণ বাবু সম্প্রদায় সম্পর্কে ভুল ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে

এই প্রসঙ্গে আর একটা জিনিস আমি আপনাদের বলে যেতে চাই। তা হচ্ছে গ্রামীণ বাবু সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে অনেক সময় নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় অপরকে শোষণ করে তারা বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন এবং এদের বেশিরভাগ অংশই গ্রাম ছেড়ে দিয়ে শহরে বসে বেশ মজা লুটছেন। এঁরা মাঝে মাঝে গ্রামে আসেন, কিছু দান-খয়রাত করেন, গ্রামে হয়তো একটা সেতু করে দেন, স্কুল কমিটিতে কিছু টাকা দেন এবং তার দ্বারা আপনাদের কাছে তাঁরা এক একজন দানবীর সেজে যান। আপনাদের রক্ত শোষণ করেই যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ওদের ঘরে জমছে, তার থেকেই তারা ছিঁটেফোঁটা দিয়ে দানবীর সাজেন। আর আপনারা মনে করেন, কর্তাবাবু লোক ভাল। গ্রামে এলে আপনারা তাকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। কারণ আপনারা মনে করেন, কর্তাবাবু গ্রামের জন্য অনেক কিছু করে দিয়েছেন। আপনারা একবারও ভাবেন না যে, কর্তাবাবু যে টাকাটা দান করলেন, সেই টাকাটা কর্তাবাবুর পকেটে এল কী করে? তাঁর দান করবার দরকার কী? আর আপনাদেরই বা দান নেওয়ার প্রয়োজন কী? আপনার টাকা আপনাকে ঠকিয়ে যে চুরি করে নিয়েছে, তার থেকে আপনি দান নেবেন কেন? একবার জোচ্চুরি করে আপনাদের টাকা যে লুটে নিয়ে গেল, সেই টাকার একটা অতি সামান্য অংশ আবার দান করে আপনাদের সামনে সে দানবীর সেজে গেল। আর আপনারা এমনই দুর্বল, যেহেতু আপনাদের চাষের বীজ

দরকার, গ্রামের মধ্যে আপনাদের একটা সেতু দরকার, কর্তা সেটা করে দিলেই আপনারা তখনই কর্তার কেনা গোলাম হয়ে গেলেন। গ্রামের মানুষগুলো যাদের শোষণের চাপে মরে উজাড় হয়ে গেল, তাঁরা একদিন গ্রামে পদধূলি দিয়ে দু'টো টিউবওয়েল, কি একটা রাস্তা, নয়ত একটা সেতু বা একটা পাঠশালা করে দিয়ে আপনাদের কাছে মহা দরদী, ভাল লোক সেজে গেলেন। আর আপনারাও মনে করলেন, কর্তাবাবু লোক খুব ভাল। তাঁর খুব দরাজ দিল্। একটা শয়তান, যে আপনাদের ঠকিয়ে আপনাদের জীবন শেষ করে দিল, সেই আবার চালাকি করে আপনাদের কাছে মহা দানবীর সেজে গেল। এইভাবেই আপনারা যুগ যুগ ধরে ঠকে আসছেন। আপনাদের এই মূর্খতা এই জন্যই যে, আপনাদের বিপ্লবী চেতনা, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা এবং আপনাদের সংগঠনের দৃঢ়ভিত্তি কোন কিছুই নেই। এই ধরনের নানা মনোভাব যা আজও আপনাদের মধ্যে আছে, সেই সমস্ত মানসিকতা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে।

ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে বিপ্লবের স্বার্থ ও সংগঠনের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে

এছাড়া আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, চাষী আন্দোলনগুলো পরিচালনা করতে গিয়ে সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা না থাকার জন্য দৈনন্দিন অভাববোধ থেকে আপনাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ কখনও কখনও মারাত্মকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যা বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বড় বড় জমির মালিক যারা, তাদের যেমন সম্পত্তির লোভ এবং তার জন্য তারা অপরকে ঠকায়, আপনাদের মধ্যেও জমি বিলির সময় সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি লোভের মানসিকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় জমির মালিকদের মধ্যে যে সম্পত্তির লোভ বড় আকারে আছে, তার বিষাক্ত জীবাণু আপনাদের মধ্যেও আছে। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, জমির প্রতি মায়া এবং সম্পত্তির প্রতি মোহ আপনাদের মধ্যে এত বেশি যে, জমি বিলির সময় কে পাবে, কে পাবে না, তা নিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যেই অনেক সময় লড়ালড়ি শুরু করে দেন। আপনারা এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করেন না যে, সব মানুষ একত্রে জমি পেতে পারে না। আপনারা সবাই মিলে যতটুকু জমি উদ্ধার করলেন, তা সমানভাবে ভাগ করলেও সেই জমি সবাই পেতে পারে না। তাহলে, আপনাদের গ্রামের লোকদের প্রথমে বসে সংগঠনের ঐক্য বজায় রেখে ঠিক করে নিতে হবে — যে জমি উদ্ধার হ'ল, সেই জমি কোন্ লোকদের মধ্যে প্রথম বিলি করা দরকার। তাদের প্রথমে জমি দেবার পর যদি থাকে, তাহলে অন্যেরা নেবে। অথচ আপনারা আগে কোনকিছু ঠিক না করে প্রত্যেকেই প্রথমে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দেন। মাত্র দু'বিঘা বা তিন বিঘা জমির জন্য আপনারা নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু করেন, যা হয়তো আপনারাও শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন না। আর এই কাড়াকাড়িকে কেন্দ্র করে আপনাদের মধ্যে লেগে যায় মারামারি এবং তার ফলে জনগণের ঐক্যে আসে ফাটল। এ নিয়ে এমনকী সংগঠনের অসচেতন কর্মীদের মধ্যে পর্যন্ত দেখা দেয় বিদ্বেষ, রেষারেষি, লড়ালড়ি। এর ফল কী হয়? নিজেদের সংগঠনকে আপনারা দুর্বল করে ফেলেন।

জমি বিলি-বণ্টনের যে সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধান করবার সময় আপনাদের দু'টি জিনিসের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, লড়াই করে জমি যতটুকু উদ্ধার করলেন তা যেহেতু যত লোকের জমির প্রয়োজন তার তুলনায় কম, তখন নিজেরা লড়ালড়ি করে সংগঠনকে দুর্বল না করে পার্টির নেতৃত্বে অথবা কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের[৪] স্থানীয় কমিটির নেতৃত্বে গ্রামে বসে আপনাদের প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে কার কার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যেমন ধরুন, একজন শক্ত-সমর্থ গরিব চাষী, যে করেই হোক্ পরিশ্রম করে সে কিছু উপায় করতে পারে, তার এক কাঠা জমি। আবার তার পাশেই থাকে একজন অসমর্থ বৃদ্ধ, তারও এক কাঠা জমি। দু'জনেরই ঘরে অভাব আছে। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যে যে সমর্থ সে যা হয় কিছু করে, দরকার হলে মোট বয়ে সংসার চালাতে পারে। অথচ বৃদ্ধটির সে উপায়ও নেই। এখন এই দু'জনের মধ্যে যদি জমি বণ্টনের প্রশ্ন হয়, তাহলে সচেতন চাষী কর্মী হলে, বিপ্লবী হলে, সমর্থ চাষীটি নিজেই বলবেন যে, আগে বৃদ্ধ চাষীটি পাক্ তারপর যদি থাকে তিনি নেবেন। এইরূপ মনোভাব সকলের হওয়া উচিত। এই মনোভাব সকলের হলে আপনাদের সংগঠনে কোন দালাল ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না, কোন লোক এসে তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না।

সংগঠনের ঐক্যকে অটুট রেখে জমি বিলির প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হবে

দ্বিতীয়ত, আপনারা নিজেরাই এখানে রিপোর্ট পেয়েছেন যে, অনেক জায়গায় গরিব ও ভূমিহীন চাষীরা জমি বণ্টনের সময় নিজেরা বসে নেতাদের সহায়তায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার মীমাংসা করে নিয়েছে। পার্টির

প্রতি এবং নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজেদের সংগঠনের ঐক্যকে তারা চোখের মণির মত রক্ষা করেছে। কোন কারণেই নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতিকে তারা বিনষ্ট হতে দেয়নি, কারোর প্ররোচনাতেও নয়। কারণ আপনারা দেখেছেন, এসব কাজে যারা প্রতিবিপ্লবী দল তারা তো বটেই, এমনকী যারা বিপ্লবের মুখোশ পরে লালঝান্ডা নিয়ে আসে তারাও গরিব চাষীকে বিভ্রান্ত করে গরিব মানুষের সাথে গরিব মানুষের লড়ালড়ি লাগিয়ে দেয়। আপনি হয়তো লড়াই করে তিন বিঘা বেনাম জমি দখল করেছেন। আর একটা পার্টি লালঝান্ডা উড়িয়ে অন্য কিছু গরিব চাষীর মধ্যে হীন স্বার্থবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে সেই জমি দখল করার জন্য আপনার সাথে তাদের লড়ালড়ি লাগিয়ে দেয়। আপনারা মনে রাখবেন, হীন স্বার্থবুদ্ধিকে উস্‌কে দিয়ে কোন বড় বা মহৎ কাজ করা যায় না। কোন পার্টি এইরকম অন্যায় আচরণ ও গর্হিত কাজের দ্বারা আপনাদের এইভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে কী হয়? গরিব মানুষ বিভক্ত হয়ে যায়। গরিব চাষী এ-পার্টি সে-পার্টিতে বিভক্ত হয়ে লড়াই শুরু করে দেয়। আর এই সব মেকি লালঝান্ডা পার্টিগুলোর সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্য যারা জোতদার, গ্রামীণ সমাজের যারা বুর্জোয়াশ্রেণী, তারা গরিব মানুষের নিজেদের মধ্যে এই লড়াইগুলিকে দেখে এবং তারিফ করে। এমনকী সুযোগ বুঝলে এইসব জোতদাররা নিজেরাই কিছু গরিব চাষীকে পয়সা দিয়ে আর হাতে লালঝান্ডা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, যাতে তারা গরম গরম বিপ্লবী কথা বলে দু'চার বিঘা জমি এদিক ওদিক থেকে জড়ো করে গরিব চাষীদের বিভ্রান্ত করে তাদের মধ্যে আলাদা সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। একাজ তারা কীভাবে করে? ধরুন, যতটুকু জমি উদ্ধার হ'ল, তাতে কিছু চাষী জমি পেল, কিছু চাষী কিছুই পেল না। সঙ্গে সঙ্গে জোতদারদের একজন দালাল বা প্রতিবিপ্লবী পার্টির একজন লোক এসে যারা জমি পেল না তাদের বলল, 'দেখলি ওদের জমি দিয়েছে, তোদের দেয়নি। চল্ আমাদের পার্টিতে আয়, আমরা ওদের জমিগুলো কেড়ে নিচ্ছি।' তারাও জমি পায়নি বলে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের সংগঠন ছেড়ে তার সঙ্গে গিয়ে জুটলো। এ হ'ল ঘর শত্রু বিভীষণের মতো আচরণ। এইভাবে প্রত্যেক কথায়, সাময়িক স্বার্থের ছোটখাট কথায়, মূল রাজনীতির লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পাল্টানোর জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতি আপনাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংগঠন যদি এরকম ঢিলেঢালা থাকে, যদি কর্মীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে আজ এ সংগঠন, কাল সে সংগঠন করতে থাকেন, তাহলে তো বিপ্লব হতে পারে না। গরিব চাষীরা নিজেরাই যদি জমি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি লাগান, তাহলে তাঁরা বিপ্লব করতে পারবেন না। গরিবের জমি দখল করার জন্য আরও কিছু গরিবকে যারা উত্তেজিত করে দেয় তারা তো বিপ্লবী হতে পারে না। এই সমস্ত সাধারণ কতকগুলো বিচার আপনাদের মধ্যে কাজ করা দরকার।

সামাজিক সম্পত্তি লাঠির জোরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার করুণ ইতিহাস

আপনাদের মনে রাখতে হবে, চাষীর জমি পাওয়ার জন্য লড়াই করা দরকার — একথা ঠিক;কিন্তু জমির প্রতি তার লোভের দরকার নেই। জমি পাওয়া হ'ল আপনাদের একটা ন্যায্য দাবি। কারণ আপনাদেরই পূর্বপুরুষরা বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই করে, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে, পাথুরে জমি খুঁড়ে খুঁড়ে জমি চাষের যোগ্য করেছে। 'ভগবান চাষের যোগ্য জমি করে জমিদারদের জমির মালিক করে দিয়েছে' — এভাবে জমির মালিক কেউ হয়নি। জমি চাষের উপযুক্ত করেছে সমাজের মানুষগুলো সবাই মিলে। সুদূর অতীতে সমাজের সমস্ত মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করত এবং জীবিকা অন্বেষণের জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এইভাবে তারা ঘুরতে ঘুরতে কালক্রমে এক একটা জায়গায় এসেছে। তারপর বাঘের সঙ্গে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে অমানুষিকভাবে লড়াই করে, অমানুষিক পরিশ্রম করে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে পাথুরে জমি ও অনাবাদী জমিগুলোকে চাষের যোগ্য করেছে। এইভাবে জমি চাষের যোগ্য করে তারা যখন স্থায়ী হয়ে বসেছে, ফসল ফলাতে শুরু করেছে, তখন তাদের ভিতর কিছু লোক যারা সর্দার ছিল, যাদের লাঠির জোর ছিল, তারা সেই লাঠির জোরে অন্যদের ঠকিয়ে জমির মালিক হয়ে বসেছে। সমস্ত মানুষের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ সেদিন গায়ের জোরে আত্মসাৎ করেছিল কারা? তারাই — আজকে যাদের জমিদারবাবু দেখছেন, তাদেরই পূর্বপুরুষরা। আজকে যে সব বড় বড় জমির মালিকদের চেহারাগুলোকে আপনারা এরকম টুসটুসে দেখছেন, কয়েকশো বছর আগে, কয়েক হাজার বছর আগে, তাদের পূর্বপুরুষদের পায়ের আঙুল এরকম সুন্দর ছিল না, এত ভদ্রবাবু তারা ছিল না। তারা লাঠিয়াল ছিল, ডাকুর সর্দার ছিল। তারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে একত্রে থেকেই লড়াই করেছে। তারপর লাঠির জোরে তারা রাজা-উজির

হয়েছে, সামন্তপ্রভু হয়ে বসেছে। তারপর ইংরেজ আমলে ইংরেজদের সেবা করে জমিদার হয়েছে। ফলে যে জমি একদিন সব মানুষ মিলে পরিশ্রম করে চাষের যোগ্য করেছিল, যে জমির ওপর একদিন সমাজের সমস্ত মানুষের অধিকার ছিল, সেই জমি পরবর্তীকালে লাঠির জোরে আর অন্যায়ভাবে আপনাদের ঠকিয়ে দখল করে নিয়েছে একদল লোক। তার থেকে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, তার থেকে ইংরেজ আমলে জমিদারতন্ত্র। এই জমিতে ওরা আজ ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ ওরা আপনাদের বোঝাচ্ছে — এটা মালিকের সম্পত্তি, আর আপনারা মালিকের দাস। ফলে মালিকের দাস হিসাবে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করা আপনাদের ধর্ম। আপনারা যে গোলাম হয়ে জন্মেছেন, তা আপনাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল। ওরা পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে এই জন্মে মালিক হয়ে মদ খাচ্ছে এবং মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করছে। আর আপনারা বহু অপরাধের ফলে তাদের গোলাম হয়েছেন। এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ওরা বুঝিয়েছে, রাজা হচ্ছে ভগবানের সমকক্ষ। সেই রাজা অত্যাচারী হোক্, মদ্যপান করুক, আর মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করুক — রাজাই হচ্ছে ভগবান। তার সেবা করাই আপনাদের কাজ। এই সব শিখিয়ে শিখিয়ে আপনাদের মনটাকে পর্যন্ত ওরা গোলাম করে দিয়েছে। কারণ হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আপনারা ভুলে গিয়েছেন। ফলে অল্প কিছু লোক কী করে সমস্ত জমির মালিক হয়ে গেল আর আপনারা সব গোলামে পরিণত হলেন, তার একটা করুণ ইতিহাস আছে। আপনারা যারা রাজনীতি করতে আসবেন তারা শুধু জমি, মজুরিবৃদ্ধি আর রিলিফের দাবিদাওয়া নিয়ে যদি লড়েন তাহলে সেই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জোর বেশি পাবেন না। আপনাদের এই ইতিহাস জানতে হবে। পার্টির নেতারা এবং কর্মীরা আপনাদের সেই ইতিহাস বলে দেবে। সেই ইতিহাস জানলে আপনাদের বুকের ভিতরটা ধক্ করে জ্বলে উঠবে। যে জমি আপনাদের পূর্বপুরুষরা সকলে মিলে চাষের যোগ্য করেছিল, যে জমির মালিক আপনারা সকলেই ছিলেন — ভগবান যদি কোথাও থাকেনও, তিনি কাউকে মালিক করে দেননি — সেই জমিতে আজ আপনি গোলাম হয়ে গেলেন কী করে? কী করে আপনাদের সেই জমি গায়ের জোরে বেহাত হয়ে গেল? তারপর সেই জমি রক্ষা করার জন্য মালিকরা সমাজের অধিপতি সেজে আইন করল আর আপনারা সেই আইন মানতে মানতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন, ভুলে গেলেন জমি বেহাত হওয়ার করুণ ইতিহাস।

তারপর ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে একসময়ে রায়তারি আইনের দ্বারা ভূমিজ প্রজাদের জমির মালিক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চাষীদের অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব এবং সংগঠন দুর্বল থাকার ফলে ভূমিজ প্রজাদের বেশিরভাগই সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। বড় বড় জমির মালিকরা তাদের ঠকিয়ে, আইনের কারচুপি করে, আমলাদের যোগসাজসে সেই জমি নিজেরাই হস্তগত করেছিল। তারপর আবার কংগ্রেসি আমলে এসে যখন মধ্যস্বত্ব বিলোপ আইন বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ হ'ল, সে সময়েও, যেমন আমি আগেই বলেছি, তার বেশিরভাগ জমি গরিব চাষীদের ফাঁকি দিয়ে আমলাদের সঙ্গে যোগসাজসে অন্যেরা হাতিয়ে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক যতটুকু জমি পেয়েছিলেন, সে জমিও আপনারা রাখতে পারেননি। সে জমি চলে গিয়েছে কী করে? সে জমি চলে গিয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে, যা বর্তমান সময়ে আপনাদের বাঁচবার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং যাকে না হটাতে পারলে আপনাদের মুক্তি নেই। এখন, এই বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি আপনারা আপনাদের লড়াইকে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চান, তাহলেও অতীত ইতিহাস আপনাদের খানিকটা জানতে হবে। তবেই আপনারা সে লড়াইয়ে জোর পাবেন। তবেই আপনারা কূট ধর্মবুদ্ধি, সম্পত্তিবুদ্ধি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবেন। একসময়ে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা লাঠিয়ালদের কাছে, সর্দারদের কাছে হেরে গিয়ে গোলামে পরিণত হয়েছিল আর গায়ের জোরে জমি দখল করে তারা হয়েছিল রাজা। কিন্তু সেই বিষরক্ত আপনাদের মধ্যেও প্রবাহিত। তাই তিন খণ্ড জমির জন্য, এক খণ্ড জমির জন্য আপনারা নিজেরা লড়ালড়ি করেন। এটাও তো সেই বিষরক্ত, যা জমিদারদের মধ্যে প্রবাহিত। তারা বেশি জমি নিয়ে লাঠালাঠি করে, আপনারাও সেই একই জমির মোহে, দু'কাঠা, তিন কাঠা, আট কাঠা, এক বিঘা, দু'বিঘা জমি নিয়ে গরিবরা-গরিবরা পর্যন্ত লাঠালাঠি লাগিয়ে দেন। আপনাদের কাজ হবে, যত বেনাম জমি এবং খাস জমি আছে, তা উদ্ধার করে যাদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন অর্থাৎ যারা তুলনামূলক বিচারে সবচেয়ে বেশি গরিব এবং অসহায়, আগে তাদের মধ্যে বণ্টন করা এবং এই বণ্টনের ব্যাপারে যাতে নিজেদের মধ্যে কোনমতেই রেষারেষি না আসে সেটা দেখা। কারণ রেষারেষি হলে আপনাদের নিজেদের ঐক্য বিপন্ন হবে। ফলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে মূল সংগ্রাম, সেটাই ব্যাহত হবে।

বিপ্লব ও সংগঠনের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ পরিত্যাগ করতে হবে এবং বিপ্লবী রাজনীতি শিখতে হবে

এসব জিনিস বুঝতে হলে, আমি আগেই বলেছি, আপনাদের বিপ্লবী রাজনীতি শিখতে হবে। তবেই একমাত্র আপনারা এসব জিনিস ধরতে পারবেন। এই বিপ্লবী রাজনীতি আপনারা শিখবেন কাদের কাছ থেকে এবং কীভাবে? মনে রাখবেন, এই বিপ্লবী রাজনীতি শেখার প্রধান শর্ত হ'ল, প্রথমত, বিপ্লবী দল চিনে নেওয়া এবং সেই বিপ্লবী দলের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য স্বীকার করা। দ্বিতীয়ত, দৈনন্দিন সংগ্রামগুলো পরিচালনা করতে করতে এই বিপ্লবী রাজনীতি আপনাদের শিখতে হবে দলের সেইসব বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছ থেকে, যারা এই সমস্ত জিনিসের আসল চরিত্র পর্দা খুলে খুলে আপনাদের দেখাতে পারে। অথচ আপনারা তা করেন না। আপনারা রাজনীতি শেখার জন্য সংগঠন করেন না। আপনারা বরং সংগঠনের কাছে সবসময় হয় এটা চান, নয় ওটা চান, না হয় মামলার তদ্‌বির করে দিতে বলেন। আর, মামলার তদ্‌বির করে না দিলেই আপনাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তাহলে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের বিপ্লবী রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজন কি আপনাদের কোর্টের তদ্‌বির করার জন্য? আপনাদের নেতার প্রয়োজন কী? আপনারা মনে রাখবেন, নেতারা হলেন সেনাপতি। তাঁরা আপনাদের দু'ভাবে পরিচালনা করেন। প্রথমত, তাঁরা আপনাদের বুদ্ধি দেন, জ্ঞান দেন ও বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেন এবং প্রতিটি সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে তাঁরা আপনাদের শেখান। অন্যদিকে, তাঁরা আপনাদের প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে, তার পুলিশ-মিলিটারির বিরুদ্ধে, তার নানা ছলাকলা এবং কৌশলের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ের কৌশলগুলো শেখান। অথচ আপনারা নেতাদের কাছ থেকে এসব জিনিস আয়ত্ত করবেন না। আপনারা তাদের দিয়ে উকিলের কাজ করাবেন। তা আমি বলি, উকিল তো পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। তার জন্য বিপ্লবী দলের দরকার কী? আপনারা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মনে করেন তাঁরা সব বিনাপয়সার উকিল। আপনারা মনে করেন, যেহেতু আপনারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মিছিলে যান এবং স্লোগান দেন, ফলে তাঁরা আপনাদের বিনাপয়সায় উকিলের কাজ করে দেবে। আসলে তাঁরা এমনিতেই করে দেন। করে দেওয়াটা তাঁদের একটা কাজ। কিন্তু আপনাদের যে কথাটা বুঝতে হবে, তা হ'ল, চব্বিশ ঘণ্টা যদি তাঁদের আপনারা এইভাবে ব্যস্ত রাখেন, তাহলে কখন তাঁরা আপনাদের রাজনীতি শেখাবেন? কখন আপনাদের সংগঠিত করবেন? কখন আপনাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলবেন?

আপনাদের সাধারণ স্তরের চাষীদের মধ্যে আর এক ধরনের মানসিকতাও দেখা যায়। তারা কোন সমস্যার সামনে পড়লে, যদি কোন বড় নেতা চোখের সামনে থাকে, তাহলে গ্রামের কমিটির কাছে না গিয়ে সরাসরি সেই বড় নেতার কাছে যায়। তাদের ধারণা নেতা যখন বড়, তখন তার করে দেওয়ার ক্ষমতাও বেশি। ফলে বড় নেতার কাছে না গেলে তাদের শান্তি হয় না। কিন্তু এইভাবে যদি বড় নেতাদের প্রতিদিন হাজার হাজার চাষী তাদের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত রাখে, তাহলে পার্টির নেতারা সংগঠন গড়ে তোলার বড় বড় পরিকল্পনা, গ্রামে-গ্রামে ও অঞ্চলে-অঞ্চলে পার্টি কমিটি গঠন করা এবং হাজার হাজার লোককে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের নিয়ে লৌহদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলবার সময় পাবেন কখন? ফলে 'শুধু জমি পাইয়ে দেন, কোর্ট-কাছারিতে তদ্‌বির করে দেন, বি ডি ও'র কাছ থেকে কিছু পাইয়ে দেন, ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দেন, অমুকে পেয়েছে সে সংগঠনে থাকবে, আমি যদি না পাই তবে আমি কেন থাকব' — এসব করলে আপনারা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারবেন। মনে রাখবেন, এগুলো আপনাদের বিপ্লবী আন্দোলনের এবং যুক্ত আন্দোলনের বিরোধী চিন্তা। কারণ এইসব মনোভাবনার দ্বারা সংগঠন গড়ে তোলা এবং সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখবার স্বার্থের থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় করে দেখা হয়। ফলে আপনাদের দৈনন্দিন আন্দোলনের হাতিয়ার যে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন, সেই সংগঠনই এর দ্বারা দুর্বল হয় এবং খেতমজুর ও চাষী সংগঠন দুর্বল হলে শেষপর্যন্ত আপনাদেরই সামগ্রিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং এইসব মনোভাবের বিরুদ্ধে আপনাদের নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে এবং চাষী কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি আপনাদের কাছে বলে যেতে চাই। আমি প্রথমেই আলোচনা করে আপনাদের দেখিয়েছি যে, যতক্ষণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আছে ততক্ষণ এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার করে বা লড়ালড়ি করে দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে আপনাদের কিছু কিছু সমস্যার মীমাংসা হতে পারে, কিন্তু বিপ্লবের আঘাতে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে মজুর-চাষীর ক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত

চাষী জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না, হতে পারে না। মজুর-চাষীর এই ক্ষমতা দখল বলতে কী বোঝায়, তাও আপনাদের ভাল করে জানা উচিত। আপনারা মনে রাখবেন, মজুর-চাষীর এই ক্ষমতা দখল করা বলতে বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে সরকার প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রী হওয়া বোঝায় না। মজুর-চাষীর এই ক্ষমতা দখল বলতে বোঝায় — পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে মজুর-চাষীর নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পুলিশ-মিলিটারির বদলে মজুর-চাষীর নিজস্ব পুলিশ-মিলিটারি বাহিনী হয়েছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বর্তমান কোর্ট-কাছারির বদলে মজুর-চাষীর স্বার্থের পরিপূরক বিচারব্যবস্থা অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে কোর্ট-কাছারি পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং তা মজুর-চাষীরা নিজেদের লোকদের দ্বারাই চালাচ্ছে অর্থাৎ এককথায় তারা নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। যতদিন এই অবস্থার সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন আন্দোলন করে বা উমেদারি করে কিছু কিছু দাবি মেটানো সম্ভব হলেও গরিব মানুষের আসল সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। এই কথাটা সচেতন চাষী কর্মীরা অন্যদের বুঝিয়ে দেবেন। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, যখনই কোন জিনিসের মীমাংসা হয় না বা সমাধান হয় না, তখনই অপর কোন দালাল পার্টির লোক এসে আপনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তারা নানা কথা বলে সংগঠন সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেয়। তারা সংগঠনের কোন নেতাকে দেখিয়ে বলে, 'এই তো উনি এম এল এ হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু তোদের কী করে দিয়েছেন?' তিনি সাধ্যমতো আপনাদের অনেক কিছু করে দিয়েছেন, আবার হয়তো অনেক কিছু করে দিতেও পারেননি এবং আপনারা দেখেছেন, সমস্ত সমস্যার মীমাংসা বিপ্লবের আগে করে দেওয়াও সম্ভব নয়। তাহলে যে বিপ্লব না হলে গরিবের সব সমস্যার সমাধান হবে না, সেই বিপ্লবের জন্য গরিব মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে কোন্ পার্টি শিখিয়েছে এবং কোন্ পার্টি বিপ্লবের জন্য চাষীদের মধ্যে সংগঠন করতে শিখিয়েছে — আপনাদের কাছে সেইটাই হবে আসল বিচার্য বিষয়। কিন্তু এ ব্যাপারে নানান সময়ে আপনাদের মধ্যে, এমনকী অতি তুচ্ছ কারণেও মারাত্মক বিভ্রান্তি দেখা দেয়, যার সুযোগ বিপক্ষ দল এবং শত্রুপক্ষের লোকেরা পুরোপুরি গ্রহণ করে আপনাদের লড়াইয়ের মূল হাতিয়ার যে সংগঠন, সেই সংগঠনকেই দুর্বল করে দেয়। আপনাদের নিজেদের মুক্তির লড়াইয়ের স্বার্থেই এই সমস্ত মানসিকতা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে।

সংগঠনের প্রকৃতি কী ধরনের হবে

এখন, সংগঠন সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা বলব। আপনাদের প্রথমে বুঝতে হবে, এই যে লৌহদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার কথা আমি আপনাদের বলছি তার প্রকৃতি কী ধরনের? একটা কথায়, একটা হুইসেলের আওয়াজে, একটা বিউগলের ডাকে, একটা ড্রাম বা ঢোলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা গ্রামের যত লোক আছেন, তারা তৎক্ষণাৎ লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে যান — আমি সংগঠন বলতে তেমন ধরনের সংগঠনের কথা বলছি। গ্রামের পার্টি কমিটি বলে দিয়েছে মিছিল করতে হবে — ট্যাঁড়া পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমস্ত যুবকবৃন্দ, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে খাড়া হয়ে গেল। বাকি সব কাজ তারা পরে করবে। কারণ তারা বুঝেছে, সংগঠন হচ্ছে তাদের চোখের মণির মত। চোখ গেলে যেমন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, তেমনি সংগঠন দুর্বল হয়ে গেলে মানুষের সংঘশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সংগঠনের প্রকৃতি হচ্ছে — মিটিং হোক্, মিছিল হোক্, লড়ালড়ি হোক্, কোথাও যাবার দরকার হোক্, স্থানীয়ভাবে অথবা যে কোন জায়গায় সমাবেশ হোক্, আপনারা পার্টি কমিটির নির্দেশে এককথায় সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে প্রস্তুত হতে পারেন। এইরকম একত্র হয়ে পার্টির আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং একত্রে চলতে পারাকেই আমরা বলি সংগঠন। আপনারা মনে রাখবেন যে, পার্টির নামের পিছনে বা কিছু নেতাকে কেন্দ্র করে কতকগুলো লোক জড়ো হলেই এবং নেতাদের নির্দেশে একসঙ্গে কাজ করতে পারলেই তাকে রাজনৈতিক সংগঠন বলা চলে না। প্রায়শঃই দেখা যায়, বিভিন্ন এলাকার প্রতিটি কর্মীই নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকেন এবং উপর থেকে নির্দেশ এলে তাকে হয়তো কার্যকর করতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেরা বসে দলের আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে বা কোন বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারেন না। এইরকম ঢিলেঢালা অবস্থায় কিছু লোক জড়ো হলেও তাকে সত্যিকারের রাজনৈতিক সংগঠন বলা চলে না — বিপ্লবী সংগঠন তো দূরের কথা।

আর একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন, আপনাদের নিজেদের মধ্যে যা ঝগড়া তা আপনারা পার্টির

স্থানীয় নেতৃত্বের মারফতই মীমাংসা করে নেবেন — সংগঠনের প্রকৃতি এরূপ হওয়া চাই। যদি স্থানীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের মনঃপূত না হয়, তাহলে আপনারা ওপরের কমিটির কাছে, আরও বড় নেতার কাছে আপিল করবেন। কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে আপনারা কোর্টে যাবেন না বা রেষারেষি করে সংগঠন ভেঙে দেবেন না বা সংগঠনকে দুর্বল করবেন না। কোর্ট আপনাদের কীসের দরকার? মালিকরা যদি আপনাদের কোর্টে ফাঁসায়, তখন আপনাদের কোর্টে যেতেই হয়। কিন্তু আপনারা — গরিবরা-গরিবরা লড়ালড়ি করে কখনও কোর্টে যাবেন না। আপনাদের নিজেদের মধ্যে যা ঝগড়া তা আপনারা আপনাদের নিজেদের গ্রাম কমিটি, পার্টি কমিটি বা কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের স্থানীয় কমিটির মারফত ফয়সালা করে নেবেন। সেখানে যদি মতভেদ হয় তাহলে ওপরের কমিটির কাছে আপিল করবেন। এতে পয়সা খরচ নেই, হয়রানি নেই, উকিল বা টাউটদের হাতে পড়বার ভয় নেই। সর্বস্বান্ত হওয়ার বা নিজেদের মধ্যে বিভেদ আসারও ভয় নেই। এখানে মরেও আপনারা নিজেদের ঐক্য রক্ষা করতে পারেন। আপনারা মনে রাখবেন, কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত বিরোধ বা বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে পার্টি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে যাওয়া বিপ্লবী ও আদর্শবান মজুর-চাষী চরিত্রের পরিপন্থী। এছাড়া, আরেকটা কথা আপনারা মনে রাখবেন, সংগঠনের সদস্যদের পার্টি কমিটির কাছে, পার্টি নেতৃত্বের কাছে আনুগত্যের প্রশ্নটি যেহেতু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেইহেতু বিপ্লবের স্বার্থেই এটা প্রশ্নাতীত। কারণ গণসংগঠনের নেতৃত্বে থাকবে পার্টি। একে ছোট করে দেখলে মূল লড়াইকেই দুর্বল করে দেওয়া হয়। এসব জিনিস আপনাদের নিজেদের মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে এবং অপরের মধ্যে প্রচার করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সংগঠন দু'ধরনের — গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠন

এখন, আপনারা যে সংগঠনগুলির মধ্যে যুক্ত হয়ে একত্রে লড়াই গড়ে তোলেন, মনে রাখবেন, এই সংগঠন হচ্ছে দু'ধরনের। যেমন, এই যে আপনারা একত্রে মিছিল করেন, ঘেরাও করেন, দাবি পেশ করেন, মিটিং করেন, কখনও কখনও হাতে-কলমে জোতদারদের সঙ্গে, পুলিশের সঙ্গে লড়ালড়ি করেন — এটা একটা সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা করেন, যাকে আমরা বলি মজুর-চাষীদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠন। যেমন, আপনাদের গ্রামের গরিব চাষী-মজুরদের লড়াইয়ের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠন কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন, যা আপামর গরিব চাষী ও খেতমজুরদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠনের মধ্যে জড়ো করে। তাছাড়া চাষীদের আরও নানাধরনের সংগঠন থাকে। যেমন, কো-অপারেটিভ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইত্যাদি। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, সংগঠনের শুধু এই রূপ দিয়ে বড় কাজ করা যায় না, বেশিদূর এগোনো যায় না। শুধুমাত্র এই ধরনের সংগঠন দিয়ে বড়জোর কী হয়? দু'একটা দাবি, যা এখনই না মিটলে আপনাদের জীবন চলে না, সবাই মিলে এই ধরনের সংগঠনের মধ্য দিয়ে তা আদায় করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসেন। সেই দাবিগুলি আদায় হয়ে গেলে বা সেই দাবিগুলি আদায়ের আন্দোলন চালাতে চালাতে যদি প্রচণ্ড মার খেয়ে যান বা সংগঠনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসে, তাহলে সংগঠনের মধ্যে ভাঙন ধরে, সংগঠন ছত্রখান হয়ে যায়। সংগঠনের মধ্য থেকে কিছু লোক ভয়ে পালিয়ে যায়। আবার কিছু লোক হয়তো দালাল হয়ে যায়। কিছু লোক ভাগতে থাকে, কিছু লোক ভয়ে দেখা করতে চায় না। মুখে হয়ত বলে না যে, ভয় পেয়েছে; কিন্তু আসলে কার্যক্ষেত্রে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এইরকম সব মনোভাব এই ধরনের সংগঠনের ভিতরে অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এ ধরনের ঘটনা ঘটে, এই সমস্ত সংগঠনের কর্মীদের বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক সংঘশক্তির অভাবের জন্য।

আর এক ধরনের সংগঠন আছে, যা এই সমস্ত গণসংগঠনের মধ্য থেকে বাছাই করা বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয়। তার নাম পার্টি সংগঠন। গণসংগঠনগুলোর মধ্যে যারা রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সচেতন, যারা মজুর-চাষীদের জীবনের করুণ ইতিহাস জানে, যারা জানে পৃথিবীর উৎপত্তির পর মানুষ কী করে এল, তারপর কীভাবে চাষবাস এল, সমাজ তখন কীরকম ছিল, তারপর সবাই মিলে উদ্ধার-করা জমিগুলো কী করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'ল, কী করে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হ'ল, কী করে রাজা এল, সামন্তপ্রভুরা এল, বাবু সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'ল, কী করে গ্রামের মধ্যে সুদখোর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল, কী করে পুঁজিবাদ এল, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এল, কলকারখানা গড়ে উঠল, সর্বহারাশ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল, বেকার সমস্যার সৃষ্টি হ'ল — অর্থাৎ যারা সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার সমস্ত ইতিহাস জানে এবং যারা জানে, একে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, কীভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে মজুর-চাষীর রাষ্ট্র গঠন

করা হবে, তারপর সেই রাষ্ট্র কীভাবে চালাতে হবে, সৈন্যবাহিনী কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, পুলিশবাহিনী কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, বিচারবিভাগ কীভাবে চালাতে হবে, কীভাবে প্রচার চালাতে হবে এবং কীভাবে আদর্শগত ও মতবাদগত আন্দোলন চালাতে হবে — যারা বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং তার পুলিশ-মিলিটারি ফৌজের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়বে, যারা এই লড়াইয়ে জান কবুল করবে, বেইমানি করবে না, যারা অশালীন আচরণ করবে না, যারা উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী হবে, যারা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে সেনাপতির ভূমিকা পালন করতে সক্ষম — তাদেরই নিয়ে হবে পার্টি সংগঠন। তাহলে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা, বিপ্লবীরা, পার্টি সংগঠনের সভ্য তাদেরই বলি, যারা বিপ্লব করবে, বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করবে, যারা সমাজব্যবস্থাকে পাল্টাবে, যারা দুনিয়াকে পরিবর্তিত করবে।

আবার, আপনারা মনে রাখবেন, এই পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রতিটি এলাকায় উচ্চতর পার্টি সংগঠনের রূপ হচ্ছে পার্টি কমিটি, যে কমিটির কথামতো আপনারা কাজ করেন। এখন, এই পার্টি কমিটি কি যেমন তেমন কতকগুলো লোকের নাম দিয়ে তাদের এক জায়গায় জড়ো করলেই গঠিত হয়ে যায়? না। পার্টি কমিটি — পার্টি কর্মীদের মধ্যে তেমন সব লোকদের নিয়েই গঠন করা উচিত, যারা স্থানীয় সমস্যা যাই হোক্, দলের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিকভাবে তার বিচারবিশ্লেষণ করে সাধারণ মানুষকে নিজেদের নেতৃত্বে রেখে তার মীমাংসা করে দিতে পারে। তারা যেমন সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়, আবার সাথে সাথে বিরুদ্ধ পার্টির প্রচারের ওপরও নজর রাখে এবং সেই প্রচারে যাতে কোন মজুর-চাষী বিভ্রান্ত না হয় তার জন্য সেই সমস্ত প্রচারের আসল চরিত্র ধরিয়ে দেয়। কোন দালাল পার্টি ঢুকে যাতে মজুর-চাষীদের মধ্যে ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা না করতে পারে, সেদিকে তারা খেয়াল রাখে। তারা স্থানীয় অঞ্চলের খেতমজুর ও চাষীদের যত সমস্যা — যেমন, খেতমজুরদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ এবং সারা বছরের জন্য কাজ ও মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে মজুরিবৃদ্ধির সমস্যা, সেচের সমস্যা, সস্তাদরে সার ও বীজ পাওয়ার সমস্যা, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা, প্রতিদিনকার লড়ালড়ির থেকে উদ্ভুত সমস্যা, বিরুদ্ধ পার্টির নানা অপকৌশল ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিরুদ্ধে মজুর-চাষীকে সদা সচেতন রাখার সমস্যা প্রভৃতি নিজেরাই দেখাশুনা করতে পারে এবং দালাল পার্টি খেতমজুর ও চাষীদের ঐক্যে ফাটল ধরাবার যে চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে মজুর-চাষীদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার জন্য তারা কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে। তারা চাষীদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতে পারে। এসব কাজ একসঙ্গে যারা মিলে মিশে চালাতে পারে, তাকে সাদামাটা কথায় বলে পার্টি কমিটি। তারা নেতাদের কাছে মাঝে মাঝে পরিকল্পনা বুঝতে যায়, কিন্তু সাধারণ চাষীদের প্রতিদিন নেতাদের কাছে পাঠায় না, বরং তারাই সাধারণ মজুর-চাষীর প্রয়োজনটা মিটিয়ে দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আপনাদের বলি। গরিব মানুষ যাঁরা গ্রামের মধ্যে কমিটি মেম্বার হন, পার্টির মেম্বার হন, তাঁরা অনেক সময় একটা প্রশ্ন করেন। তাঁরা বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ, আমাদের ঘরে খাবার সমস্যা, চাষবাসের সমস্যা, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে হাজার একরকমের সমস্যা। আমরা পার্টির কাজ সামাল দেব কখন?' ফলে, তাঁদের পার্টির যা কাজ দেওয়া হয় সেই কাজ পড়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে পার্টি কমিটিটা নামেই একটা কমিটি হয়। আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনারা হলেন পার্টি কমিটির মেম্বার মানে সবচেয়ে সচেতন কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক হবার আপনারা সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। আপনারাই যদি বিপ্লবের এই মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেরা এগিয়ে এসে ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করার মানসিকতা এবং মনোভাবনা না দেখাতে পারেন, তাহলে ঘরে ঘরে যারা দুর্বল লোক, যাদের বিপ্লবী শিক্ষা নেই, বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা নেই তারা তো আরও কমজোর হয়ে যাবে। তাদের কাছে এইসব যুক্তি তো আরও বড় হয়ে দেখা দেবে। শ্রেণী সচেতন বিপ্লবী কর্মী হলে এইভাবে ভাবনার রীতিটাই যে ভুল — সেটা আপনাদের বুঝতে হবে। কারণ এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধন করার প্রয়োজন তো সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারাদেরই সবচেয়ে বেশি। পুঁজিবাদী শোষণের দুর্দশাজনিত হাজার অভাব-অসুবিধার মধ্যেও মুক্তি অর্জন করতে হলে এই কাজ তো আপনাদেরই এগিয়ে এসে উদ্যোগ নিয়ে করতে হবে। এই সমাজে যারা আরাম ও আয়েসে রয়েছে, আপনাদের হয়ে একাজ তারা করে দেবে না। যে সকল দেশে বিপ্লব সফল হয়েছে, সে সব দেশের ইতিহাস পড়লেই দেখতে পাবেন — সে সকল দেশের মজুর-চাষীরা হাজারে হাজারে নিজেদের সমস্ত অভাব-অসুবিধাকে উপেক্ষা করে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল বলেই সেই সকল দেশের বিপ্লব সফল হতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবে শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র

এখন, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার জন্য যে বিপ্লব আপনাদের করতে হবে, তার সামনে মূল শত্রু কে, আর এই বিপ্লবে আপনাদের মিত্র কারা অর্থাৎ এককথায় সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণীবিন্যাস কী — তা আপনাদের ভালভাবে বুঝতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, পুঁজিপতিরা, বেনাম জমির মালিকরা, বড় বড় জোতদাররা, বড় বড় ব্যবসাদাররা, সুদখোররা এবং তাদের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং বর্তমান রাষ্ট্রের পুলিশ-মিলিটারি ও আমলা-অফিসাররা — এরা হচ্ছে বিপ্লবের শত্রুপক্ষ। আর, এই বিপ্লবের প্রাণশক্তি হ'ল শহরের মজুরশ্রেণী এবং গ্রামের ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর, গরিব চাষী। এর সাথে শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, যাতে তারা বিপ্লব বিরোধী না হয় এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে না যায়, তার জন্য তাদের বিপ্লবের মধ্যে আপনাদের টেনে আনতে হবে। গ্রামীণ মধ্যচাষী ও নিম্নমধ্যবিত্তদের সম্পর্কে এইরকম একটা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, আদর্শ নিয়ে আপনাদের চলতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, পুলিশ-মিলিটারি, বিচারবিভাগের অফিসাররা, অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল অফিসাররা, পুঁজিপতি শ্রেণী, বড় বড় ব্যবসাদার, গ্রামের বড় বড় জোতদার এবং প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেমন সরাসরি সাম্যবাদী আন্দোলন, মজুর-চাষীর মুক্তি আন্দোলন এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী — শহরের নিম্নমধ্যবিত্তরা তো নয়ই, এমনকী গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্তরাও সেরকম সবসময় শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধিতা করে না। একথা ঠিক যে, সাধারণত গ্রামীণ মধ্যবিত্তদের, এমনকী নিম্নমধ্যবিত্তদেরও শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধিতা করার একটা প্রবণতা থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাও মার খাচ্ছে, তারাও শোষিত হচ্ছে, তাদের পরিবারেও অশান্তি তাই যদি আপনারা তাদের সম্বন্ধে একটা কার্যকরী বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, তাহলে দৃঢ়চেতা ও একনিষ্ঠ সংগ্রামী না হলেও, আপনাদের মুক্তি আন্দোলনে আপনারা তাদের দোদুল্যমান সংগ্রামী হিসাবে পেতে পারেন। যদি গ্রামের গরিবদের শক্তিশালী করে, সংগঠিত করে ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের, শ্রমিক-চাষী আন্দোলনের একটা প্রচণ্ড তুফান আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন এবং গ্রামের প্রতিটি অঞ্চলে পার্টি কমিটি গঠন করে সেই কমিটির নেতৃত্বে গ্রামের ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর ও গরিব চাষীদের লৌহদৃঢ় সংগঠনে রূপ দিতে পারেন, যাতে এককথায় গ্রামের সব গরিব মানুষগুলো খাড়া হয়ে যায়, তাহলে তার প্রভাব এই গ্রামীণ মধ্যবিত্তদের ওপরেও পড়তে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদের অনেকটা সহজেই আপনাদের লড়াইয়ে সামিল করতে পারবেন।

গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল করতে হবে

আর একটা কথা মধ্যবিত্তদেরও ভাল করে বোঝাতে হবে যে, তাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ভেঙেই তো আজ গরিব চাষী সৃষ্টি হয়েছে। যারা মধ্যবিত্ত, তাদের ঘরের ছেলেদের চাকরির সংস্থান হয় না। তারা বড় বড় উজির-নাজির হতে পারে না, বা বড় বড় ব্যবসা করে তারা অনেক পয়সা রোজগার করতে পারে না। ফসল ওঠার সময়ে মধ্যবিত্তদেরও কম দামে সেই ফসল ব্যবসাদারদের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়। কারণ হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক এবং কয়লাখনির মালিক, বীরভূম জেলার এই বৈদ্যনাথ ব্যানার্জীর মতো ব্যক্তিগতভাবে ঠাণ্ডাঘরে ফসল সঞ্চয় করে রাখতে ক'জন মধ্যচাষী পারে? তাও তারা ব্যবসা করার জন্য ঠাণ্ডাঘর তৈরি করে, নিজেরা খাবার জন্য করে না। কিন্তু একজন মধ্যচাষী, এমনকী খাবার জন্যও ফসল সংরক্ষণ করতে পারে না। তাদের সেই সমস্ত ফসল তখনকার মতো বিক্রি করে দিতে হয়। কিন্তু বিক্রি যে দামে তারা ব্যবসাদারদের কাছে করে, অভাবের সময়ে সেই জিনিসই আবার দেড়গুণ, দু'গুণ দামে তাদের ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কিনতে হয়। ফলে, মধ্যবিত্তদের অবস্থাও ভাল নয়। তাদের ভেঙেই তো আজ গরিব চাষী, খেতমজুর, ভূমিহীন চাষীর সৃষ্টি হয়েছে। আজ যে সমস্ত মধ্যবিত্তরা চল্লিশ বিঘা কি পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক — যদি শুধু জমির ওপর নির্ভর করে তাদের চলতে হয়, তাহলে জিনিসপত্রের দামের চাপে এবং বংশবৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে তারাই নিম্নমধ্যবিত্ত, তারপর গরিব চাষী, তারপর একেবারে খেতমজুরে পর্যবসিত হবে। তাহলে, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা না ভাঙলে, গ্রামীণ জোতদারদের এবং বেনাম জমির মালিকদের আধিপত্য না হটালে, গ্রামীণ পণ্যের ওপর ব্যবসাদারদের এবং স্টক এক্সচেঞ্জের একাধিপত্য বিনষ্ট করতে না পারলে অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতিকে এদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে না পারলে, মধ্যবিত্তদেরও চাষবাসের সমস্যা, কৃষির উন্নতির সমস্যা, কৃষির আধুনিকীকরণের সমস্যা এবং তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের চাকরি ও

উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সমস্যার সমাধান হবে না। তাহলে, তারা কেন বাবুদের সঙ্গে, বড় বড় রাজা-উজিরদের সঙ্গে গা ঘেঁষে গরিব মজুর-চাষীর বিরুদ্ধে যাবেন এবং দু'দিকেই শত্রু বানাবেন? যারা রাঘব বোয়াল, তারা তো শুধু খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী এবং গরিব চাষীদেরই শোষণ করে না, তারা বড় হওয়ার জন্য মধ্যবিত্তদেরও ঠকায় এবং শোষণ করে। মধ্যবিত্তদের জমিগুলোকে গ্রাস করে করেই তো বড় বড় ধনী চাষীদের হাতে প্রচুর জমি জমা হয়েছে এবং তারা সব বড় বড় জোতদার হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও গরিব চাষীদের ঠকিয়েই তো মহাজনদের মহাজনী কারবার চলে। ফলে, মধবিত্তদের বোঝাতে হবে, তারা বড়লোক নয় এবং বাবুদের সঙ্গে গা ঘেঁষে তাদের লাভ নেই। তাদের বোঝাতে হবে, এই অবস্থায় বড়লোকদের সাথে গা ঘেঁষে তারা যদি গরিব মানুষের বিরোধিতা করেন, তাহলে গরিব মানুষরা বড়লোকদের অত্যাচারের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করবে কী করে? ফলে, গরিব মানুষের সাথে তাদের বিরোধ টেনে আনা উচিত নয়। বরং মূল শত্রুপুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে, দেশের অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যদি খেতমজুর ও গরিব চাষী মধ্যবিত্তদের সহযোদ্ধা হিসাবে পায়, তাহলে স্থানীয়ভাবে খেতমজুর ও গরিব চাষীর সাথে মধ্যবিত্তদের ছোটখাট যে সমস্ত বিরোধ আছে, তা পার্টি কমিটিগুলোর নেতৃত্বে তারা সহজেই আপস-মীমাংসা করে নিতে পারে। মধ্যবিত্তদের দুঃখদুর্দশা যাতে কম হয় এবং তাদের কাছ থেকে গরিব চাষীরা যাতে কম দাবি আদায় করে, সেগুলি স্থানীয় পার্টি কমিটি দেখতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদের অবশ্যই খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীদের আন্দোলনের সহায়ক হতে হবে। এইভাবে মধ্যবিত্তদের বুঝিয়ে আপনারা তাদের আপনাদের আন্দোলনে সামিল করতে পারেন।

শত্রুপক্ষকে ব্যাপকতম জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে

আর, আপনারা নিজেরাও মনে রাখবেন, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তদের আপনাদের দিকে টেনে রাখা আপনাদের বৃহত্তম লড়াইয়ের স্বার্থেই প্রয়োজন। কারণ শত্রুপক্ষ আর আপনাদের মাঝখানে এই যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তারা যদি আপনাদের ভুল আচরণের ফলে শত্রুপক্ষের দিকে যোগ দেয়, তাহলে তার দ্বারা শত্রুপক্ষই শক্তিশালী হবে। আর, যদি সঠিক পদ্ধতির দ্বারা এই মধবিত্ত সম্প্রদায়কে আপনারা আপনাদের নিজেদের দিকে টেনে রাখতে পারেন, তাহলে শত্রুপক্ষকে বৃহত্তর জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সহজেই আপনারা আপনাদের লড়াইগুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। ফলে, আপনারা বুঝতে পারছেন, মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে অহেতুক বিদ্বেষ নিয়ে চলা আপনাদের দিক থেকেও উচিত হবে না। যদি মধ্যবিত্তরা নিজেরা বিরোধ ডেকে না আনে, তাহলে বড় বড় পুঁজিপতি আর জোতদারদের সাথে মূল বিরোধে মধ্যবিত্তদের আপনারা বিরোধী করে তুলবেন না। তারা যদি নিজেদের খুব বড় বাবু ভেবে আপনাদের শত্রুতা না করে তাহলে তাদের সাথে বিরোধ ডেকে নিয়ে আসা আপনাদের উচিত নয়। কারণ লড়াইতে জিততে হলে একদিকে যেমন শত্রুপক্ষের মধ্যে ভাঙন ধরানো আপনাদের একটা কাজ, অপরদিকে শত্রুপক্ষকে বেশিরভাগ মানুষ থেকে যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্ন করাও আপনাদের কাজ। তাতে লড়াই অনেকটা সহজ হবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখবেন, 'অ্যাপিজ্' করে অর্থাৎ খোসামুদি করে এবং মধ্যবিত্তদের দোদুল্যমান চরিত্রজনিত নানা সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে যদি আপনারা আপনাদের দিকে টেনে রাখবার চেষ্টা করেন তাহলে সেই চেষ্টা আপনাদের কোনদিনই সফল হবে না। একমাত্র যদি গ্রামের সমস্ত খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীদের বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তিতে সুদৃঢ় সংগঠনের ওপর আপনারা আপনাদের সংগঠনকে দাঁড় করাতে সক্ষম হন, তবেই আপনাদের পক্ষে মধ্যবিত্তদের বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে কার্যকরীভাবে টেনে রাখা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে আর একটি জিনিসও আপনাদের খেয়ালে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, আন্দোলনের সহায়ক হিসাবেও যখন মধ্যবিত্তদের আপনারা টেনে আনবেন, তখনও তাদের প্রতি আপনাদের একটা চোখ সবসময় খোলা রাখতে হবে। কারণ আপনারা মনে রাখবেন, আপনাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা সহায়ক হিসাবে এলেও তারা দোদুল্যমান সহায়ক। তাদের মধ্যে সবসময় একটা বাবু মনোভাব বর্তমান। গরিব মানুষদের, কিষান-মুনিষ-মাহিন্দারদের, ভূমিহীন চাষী আর খেতমজুরদের ঘৃণা করবার একটা প্রবণতা তাদের আছে। যদিও এই মনোভাব সকলের থাকে না, কিন্তু তাদের অনেকের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব থাকে। তাদের এই প্রবণতার জন্য এবং ওপরতলায় ওঠবার এবং ধনী হবার তাদের মানসিকতার জন্য, যদিও তারা আজ আপনাদের সাথে থেকে

লড়ছে, কিন্তু সময় এবং সুযোগ মতো তারা ভিতর থেকে আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারে। তাই মধ্যবিত্তদের আপনারা আপনাদের আন্দোলনের সাথে নেওয়ার জন্য যেমন সবসময়ই চেষ্টা করবেন, তাদের দলে টেনে নেবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি একটা চোখ খোলা রাখবেন।

আর একটা কথা শ্রেণীসচেতন হলে আপনাদের বোঝা উচিত যে, যদি লড়াইতে আপনারা জিততে চান, তাহলে লড়াইতে একটা সাধারণ কৌশল হচ্ছে, আপনাদেরই প্রয়োজনে পারলে শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং শত্রুপক্ষের নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকলে তার সুযোগ নেওয়া। যেমন, একজন জোতদারের সাথে আর একজন জোতদারের বিরোধে যদি আপনারা একপক্ষকে খানিকটা 'ট্যাক্‌ল' করে অর্থাৎ যাকে আমরা বলি কৌশলে নাড়াচাড়া করে, নানান সম্বন্ধ করে শত্রুপক্ষের মধ্যেই একটা লড়ালড়ি লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আপনাদের পক্ষে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে সুবিধা হয়। এটা লড়াইয়ের একটা সহজ কৌশল। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, কোন বড়লোকের সাথে অন্য একজন বড়লোকের বিরোধকে কাজে লাগাবার জন্য যদি চেষ্টা করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মধ্যেই কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কারণ তাঁরা মনে করেন, ঐ বিশেষ বড়লোকের সাথে সম্ভবত দহরম মহরম করা হচ্ছে। এই সব মূর্খতা আপনাদের বাদ দিতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, শত্রুপক্ষের বিরোধ যত বাড়িয়ে দিতে পারবেন, তাদের মধ্যে যত বেশি বিরোধ সৃষ্টি করতে পারবেন, তত আপনাদের ওপর তাদের আক্রমণ দুর্বল হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের আক্রমণ তত শক্তিশালী হবে। তবে এ ব্যাপারে যে বিষয়ে আপনাদের সবসময়ে সতর্ক থাকতে হবে, তা হচ্ছে, ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি বা ব্যক্তিগত বিবেচনার ভিত্তিতে পার্টিকে না জানিয়ে এ কাজ কখনই কেউ করতে পারে না। সবসময় পার্টি কমিটির নির্দেশে এবং পরামর্শে এ কাজ করতে হবে। না হলে এর থেকেই আবার সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সুবিধাবাদের জন্ম হতে পারে। এই সমস্ত জিনিস আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে।

মজুর চাষীর নিজস্ব শক্তিশালী ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে হবে

আর, আপনাদের নিজস্ব একটি শক্তিশালী, সুশৃংখল, আদর্শনিষ্ঠ ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, একটা ব্যাজ পরলেই বা দু'দিন লেফ্‌ট-রাইট করলেই কেউ ভলান্টিয়ার হয় না। 'ভলান্টিয়ার' কথাটার বাংলা মানে হ'ল স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ পয়সার বিনিময়ে সেবক নয়। পয়সা দিলে সেবক তো রাস্তাঘাটেই পাওয়া যায়। পয়সা দিলে সেবকের অভাব কী? কাজেই 'অমুকে এম এল এ হয়েছে, উনি কিছু করে দেবেন, এই আশায় আমরা ওনার সেবা করছি' — একে স্বেচ্ছাসেবক বলে না। কিছু পাওয়ার জন্য যে সেবা করে বা লোভের বিনিময়ে অথবা মাইনের বিনিময়ে যে কাজ করে, তাকে স্বেচ্ছাসেবক বলে না। স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন কারা? আগের দিনের সেই সব সন্ন্যাসীরা — যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নেতাজি সুভাষ, ক্ষুদিরাম, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব প্রমুখ বিপ্লবীরা, যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কারোর পয়সার বিনিময়ে তাঁরা কাজ করেননি, নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেননি। পয়সার বিনিময়ে বা ব্যক্তিগতভাবে কিছু পাওয়ার জন্য তাঁরা লড়েননি। ফলে, স্বেচ্ছাসেবক বলতে গেলে সেইসব লোকদের নাম আসে, যাঁরা ছিলেন দুনিয়ার পূজ্য লোক — আগের দিনে যেমন ধর্মপ্রচারক, তার পরবর্তী সময়ে সমাজ-সংস্কারক, তারপর দেশের জাতীয় মুক্তি অর্জনের লড়াইতে যাঁরা সৈনিক। তাঁদের মতো নিঃস্বার্থভাবে, নিজেদের বাড়ি-ঘর-পরিবারকে ডুবিয়ে, পরের গঞ্জনা সহ্য করে, না খেয়ে যারা দেশের কাজ করে বেড়ায় তাদের বলে স্বেচ্ছাসেবক। আর, সেই আমাদের দেশেই বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার কথা বললেই আপনাদের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বেচ্ছাসেবক হলে কত অ্যালাউন্স পাওয়া যাবে?' দেশের মানুষের ধারণা এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মানসিকতাই হচ্ছে যদি অন্তত চা খাওয়ার এবং হাত খরচের মতো পয়সা না পাওয়া যায় তাহলে কী করে তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হবেন? এইভাবে তাঁরা চিন্তা করেন। জনসাধারণের মধ্যে এইসব মানসিকতা সৃষ্টির পিছনে আমাদের দেশের বুর্জোয়া পার্টিগুলি এবং মেকি লালঝান্ডা পার্টিগুলির অবদান কিছু কম নয়। বুর্জোয়া পার্টিগুলি তো বটেই, এমনকী সোস্যালিস্টরা ও মেকি লালঝান্ডা পার্টিগুলি পর্যন্ত সবাই মিলে পয়সা দিয়ে রাজনৈতিক কর্মী নিয়োগ করে করে এই নীতিটি এমনভাবে চালু করে দিয়েছে যে, আজ আর এর অনিষ্টকারী দিকটা কারোর চোখেই পড়ছে না। এইসব পার্টিগুলির জন্যই জনসাধারণের মধ্যে

এবং কর্মীদের মধ্যে এরূপ বিষাক্ত মানসিকতা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে এবং এরই ফলে ভলান্টিয়ার কথাটার পিছনে যে মহান আদর্শের ধারণা একসময় কাজ করত, তাই গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ফলে, আপনাদের মধ্যেও অনেকে বিবেকের দংশন বিন্দুমাত্র অনুভব না করে, 'পয়সা না দিলে কী করে কাজ করব' — এভাবে অতি সহজেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। তা আমি বলি, এইভাবে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার দরকার কী? তাঁরা সব গিয়ে পুলিশের কনস্টেবল হলেই তো পারেন। আপনারা মনে রাখবেন, স্বেচ্ছাসেবক তাঁরাই হবেন যাঁদের এই চেতনা আছে যে, তাঁরা সমাজকে পাল্টাবেন, নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি করবেন। যে নওজোয়ানেরা খাওয়া-পয়সা-জামাকাপড় জুটুক না জুটুক — এই মহান দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে স্বেচ্ছায় নিতে পারেন এবং দায়িত্ব বহন করার জন্য মনের মধ্যে একটা গর্ব অনুভব করেন, তাঁরাই স্বেচ্ছাসেবক হবেন।

যেমন, চীনে চাষী-মজুররা বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ, বিশেষ করে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইশেকের যে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে, সেই ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর বাঁধা মাইনে ও নানান অসদুপায়ে প্রচুর পয়সা রোজগার করার উপায় ছাড়াও কোট, প্যান্ট, বুট, টুপি, হেলমেট, নানা রকমের গাড়ি প্রভৃতি সবকিছু উপকরণ ছিল। আর চীনে যে চাষী-মজুররা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট এই ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে, সেই সমস্ত চাষী-মজুরদের এসব কিছুই ছিল না। তারা কেউ পা-জামা পরে, কেউ লুঙ্গি পরে, কেউ হাফ প্যান্ট পরে, কেউ গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, কেউ সার্ট গায়ে দিয়ে — তাও আবার ছেঁড়া, কেউ কাপড়ের জুতো পায়ে দিয়ে, আবার যার তাও জোটেনি সে খালি পায়েই এ লড়াই চালিয়ে গেছে। এই ছিল সেখানকার 'পিপলস্ লিবারেশন আর্মি'র চেহারা। অথচ এই পিপলস্ লিবারেশন আর্মি-ই শেষপর্যন্ত আমেরিকার এবং চিয়াং কাইশেকের মাইনে-করা ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীকে পিটিয়ে সে দেশ থেকে বিদায় করে দিয়েছে। কীসের জোরে তারা একাজ করতে পেরেছে? সে কি জামাকাপড়ের জোরে? না অস্ত্রের জোরে? আজকে ভিয়েতনামের জঙ্গলে মানুষ কীভাবে লড়ছে তাকিয়ে দেখুন। চাষীদের ঘরের বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েরা, যাদের আমরা ছেলেমানুষ বলি, সেই বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের কাঁধে পর্যন্ত রাইফেল। তারা ঘরের কাজ করছে, জমিতে চাষ করছে, আবার লড়াইয়ের বিউগ্‌ল বাজলে হাতের কাজ সেই অবস্থায় ফেলে রেখে, ভাতের থালাটি পর্যন্ত নামিয়ে রেখে, বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে, যে যেভাবে আছে সেই অবস্থায় রাইফেলটি নিয়ে ছুটে যায়। তাই এতবড় জবরদস্ত আমেরিকা, যে বোমা মেরে মেরে দেশটাকে তছনছ করে দিয়েছে, যে প্রতিদিন কয়েক হাজার কোটি টাকা করে যুদ্ধের পিছনে খরচ করছে, ট্যাঙ্ক-গোলাবারুদ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র-নাপাম বোমা দিয়ে দেশের মানুষগুলোকে শেষ করে দিতে চেয়েছে, সেই আমেরিকা আজ এত কিছু করেও শেষপর্যন্ত পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েতনাম থেকে কী করে পালাবে আজ সেই চিন্তা আমেরিকা করছে।[৫] তাহলে এত করেও আমেরিকা ভিয়েতনামে জিততে পারল না কেন? কারণ সেখানকার প্রতিটি গ্রামের চাষী, এমনকী ঘরের বৃদ্ধা মা থেকে শুরু করে প্রতিটি ছেলেমেয়ে পর্যন্ত সকলেই লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানে সকলেরই এক প্রতিজ্ঞা — আমেরিকাকে তাড়াতে হবে। অন্য কিছু না থাকে বঁটি-দা দিয়ে লড়তে হবে, তাও যদি না থাকে তাহলে কামড়ে কামড়ে শত্রুকে জখম করে দিতে হবে — এইরকম তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তারা সকলেই মরার জন্য তৈরি হয়ে আছে। মরবার জন্য তারা এক একজন কাড়াকাড়ি করছে। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, ভিয়েতনামে যে চাষী-মজুররা লড়ছে তাদের একটা স্কোয়াড আছে যাকে ওরা বলে 'সুইসাইড স্কোয়াড', অর্থাৎ আত্মাহুতি দেবার স্কোয়াড। মরবার জন্য সেই স্কোয়াডে তারা নাম লেখায়। দশজন, বিশজনের এইরকম এক একটা সুইসাইড স্কোয়াড বোমা নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিতে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে ঢুকে যায়। সেখানে গিয়ে যত পারে শত্রুদের মেরে তারা নিজেরা মরে যায়। এই মরবার স্কোয়াডে যাবার জন্য ওদের দেশে কাড়াকাড়ি। কে আগে যাবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে মান-অভিমান। যে প্রথমে না যেতে পারছে, অমনি তার অভিমান হচ্ছে — 'আমাকে তোমরা পাঠালে না, আমি কি কম? আমি কি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি না? আমি কি বিপ্লবের জন্য লড়তে পারি না? আমি কি চাষীর ঘরের উপযুক্ত ছেলে নই? আমি কি সেই বুড়বক অপদার্থ ছেলে, যে শুধু নিজের কথা ভেবে পালিয়ে বেড়ায়? আমিও তো চাষীর ঘরের সেই ছেলে, যে মুক্তি আন্দোলনে জীবন দেওয়াটা সবচেয়ে গৌরবের বলে মনে করে' — এইরকম হচ্ছে সেই দেশের প্রতিটি চাষী-মজুরের মনোভাবনা। একাজ কি কোনদিন কোন মাইনে-করা ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী দিয়ে হতে পারে? আপনারা মনে রাখবেন, এই হচ্ছে প্রকৃত

স্বেচ্ছাসেবকের রূপ। এইভাবে আপনাদেরও সমস্ত লোককে উপযুক্ত বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন, যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হবেন, তাঁরা পয়সার বিনিময়ে স্বেচ্ছাসেবক হবেন না। তাঁদের কাজ চালাবার জন্য যে পয়সা দরকার, তা তাঁরা হাজার হাজার মানুষ থেকে এক এক পয়সা করে, একমুঠো একমুঠো করে ধানচাল সংগ্রহ করে সেই কাজ চালিয়ে নেবেন। কিন্তু কাজ আপনাদের করতে হবে। তার জন্য ভলান্টিয়ার চাই এবং উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ভলান্টিয়ার চাই।

স্বেচ্ছাসেবকদের কী কী কাজ করতে হবে

এই ভলান্টিয়াররা কী কাজ করবে? তারা শত্রুর আনাগোনার খবর রাখবে। গ্রামের ভিতর বিপক্ষ দল কারা আসছে, কার ঘরে যাচ্ছে, কাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে — তার খবর তারা রাখবে। বিপক্ষ দলের লোকেরা — যারা রাজনীতি বুঝিয়ে নয়, জনসাধারণের হীন প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করে, অথবা গায়ের জোরে বা প্রলোভন দেখিয়ে গণআন্দোলনকে এবং সংগঠনকে ভাঙবার চেষ্টা করছে, তারা যাতে এইভাবে সংগঠন এবং আন্দোলনগুলিকে ভাঙতে না পারে, সেদিকে স্বেচ্ছাসেবকদের সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের এই দুষ্ট প্রভাব থেকে যে কোন উপায়েই হোক জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে। তারা পার্টির মিটিংগুলোকে সংগঠিতভাবে রক্ষা করবে। লোকজনকে মিটিং-এ শৃঙ্খলার সাথে বসাবে। আবার, মিটিং শুনতে শুনতে ঈগল পাখির চোখের মতো চারদিকে নজর রাখবে যাতে বিপক্ষ দল বা শত্রুপক্ষের লোকেরা মিটিং ভাঙতে না পারে। তারা গ্রামের মধ্যে যারা দুঃস্থ লোক তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করবে। মেয়েদের ইজ্জতহানি করার কেউ চেষ্টা করলে তার হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করবে। বয়স্ক লোকদের, বৃদ্ধদের বেইজ্জতি করলে বা অসম্মান করলে বাঁদর ছেলেদের রাস্তাঘাটে কান মলে দেবে। আবার, সাথে সাথে তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে বন্ধুর মতন তাদের ভুলটা বুঝিয়ে দেবে। তাদের বুঝিয়ে দেবে যে, এরকম করা ঠিক নয়। কারণ এঁরা বয়স্ক লোক, বাবার সমান। এঁরা হয়তো একটা কাজ ভুল করতে পারেন বা একটা ভুল বলতে পারেন। কিন্তু এঁরা আমাদের পিতৃতুল্য। এঁদের ইজ্জতকে, এঁদের সম্ভ্রমকে রক্ষা করা আমাদের কাজ। এ মানুষের ধর্ম। এ যদি আমরা না করি তাহলে আমরা মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারি না। এইভাবে এদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের শত্রু করবে না। তাহলে ভলান্টিয়ারদের একটা মস্ত বড় কাজ হচ্ছে মেয়েদের সম্মান করা, বৃদ্ধদের সম্মান করে চলা এবং এঁদের যদি কেউ অসম্মান করে তাহলে তাদের হাত থেকে এঁদের সম্মান রক্ষা করা। যারা অসম্মান করবে তাদের প্রথমে বাধা দিয়ে তারপর সহানুভূতির সাথে তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করতে হবে। তাতেও যদি কেউ না শোনে তাহলে তাদের ঘৃণা করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আর, স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ হবে হাজার হাজার মানুষ যখন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে, তখন সেনাপতির মতন, জেনারেলদের মতন, তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কীভাবে লড়াই করতে হবে, লড়াইতে কীভাবে এগোতে হবে, কোন্ সময়ে পিছিয়ে আসতে হবে, কোন্ সময় চারদিক থেকে ঘেরাও করে শত্রুকে ঘায়েল করতে হবে — এইসব স্বেচ্ছাসেবকদের জানতে হবে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষা দিতে হবে। আর, স্বেচ্ছাসেবকদের এইভাবে শিক্ষিত করা এবং তাদের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করতে হবে এবং এক একটা গ্রুপের এক একজন কমান্ডার করে দিতে হবে। কমান্ডারদের দু'টি কাজ একসঙ্গে করতে হবে। প্রথমত, স্বেচ্ছাসেবকদের হাতেকলমে ট্রেনিং দিতে হবে সাথে সাথে তাদের বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত করার জন্য এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলবার জন্য রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। এখানে স্বেচ্ছাসেবকদেরও একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, দল হ'ল সকলের কাছে সবচাইতে বড় কমান্ডার। একথা ঠিক যে, গ্রুপের যিনি কমান্ডার, তিনি যা বলবেন স্বেচ্ছাসেবকরা তা মানবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, একথার মানে হচ্ছে, যতক্ষণ তিনি দলের দ্বারা নিয়োজিত, দল তাকে কমান্ডার হিসাবে স্বীকার করে এবং তিনি দলের নেতৃত্ব মেনে চলেন, ততক্ষণ তিনি আপনাদের নেতা। কিন্তু তিনি যদি দলের বিরোধিতা করেন বা দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন অথবা দলীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন এবং দলের নেতাদের প্রতি কোনরূপ অবমাননাকর আচরণ করেন, তাহলে সেই কমান্ডারকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে আপনাদের দলের হাতে তুলে দিতে হবে। তাকে সরিয়ে দিতে হবে। দলের প্রতি এবং দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি আপনাদের আনুগত্য হবে

প্রশ্নাতীত। একটা কথা মনে রাখবেন, সুদৃঢ় শৃঙ্খলার ভিত্তি ছাড়া কোন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কাজ করতে পারে না। আজ গণআন্দোলনগুলোর সামনে যে বিপদ দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল, আদর্শনিষ্ঠ একটি ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা আপনাদের আন্দোলনগুলোর স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে।

সত্যিকারের গরিবের দলকে চিনে নিতে হবে

আর একটা বিষয় আপনাদের সামনে বলে আমি আজকের আলোচনা শেষ করব। তা হচ্ছে, আমাদের দেশে বর্তমানে যে হাজার একটা রাজনৈতিক দল আছে, তার মধ্যে সত্যিকারের গরিবের দল কোন্‌টা তা বিচার করবার দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের কী হবে তা সহজভাবে খানিকটা আপনাদের বুঝে নিতে হবে। কারণ এদের মধ্যে আবার অনেক পার্টি আছে, যারা কমিউনিস্ট বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, লালঝান্ডা ওড়ায় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলে। এইসব মেকি লালঝান্ডা পার্টিগুলির ইতিহাস, দৈনন্দিন রাজনৈতিক আচার-আচরণ এবং এই দলগুলোর মূল রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আজ সুযোগ নেই। অন্যত্র এই নিয়ে অনেক আলোচনা আমি করেছি, দলের অন্য নেতারাও করেছেন এবং এ সম্পর্কে আমাদের দলের সুচিন্তিত মতামত বহু পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মারফত ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। আমি আজকের আলোচনায় শুধুমাত্র এই দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের আচরণের একটি দিক সম্বন্ধে সামান্য কিছু আপনাদের কাছে বলব। এ ব্যাপারে আজকের আলোচনায় আমি যা বলব, আমি জানি, তাতে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। তবুও খানিকটা আলোচনা এ ব্যাপারে হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, এই বীরভূমের দিকে তাকালেই এবং বিচার করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এখানকার গরিব মানুষগুলো — যাদের সেদিন পর্যন্ত মানুষ বলেই মনে করা হত না, যাদের জানোয়ার মনে করা হত, যাদের ওপর চাবুক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাবুরা কথা বলত — সেই মানুষগুলোকে জাগিয়েছে কারা? আমাদের দেশে এই সমস্ত তথাকথিত মার্কসবাদী পার্টিগুলি আমাদের কাজ শুরু করার বহুদিন আগে থেকেই এদেশে ছিল এবং এইসব দলগুলি কৃষক সভা, কৃষক সমিতি প্রভৃতি নামে তাদের নিজ নিজ সাধ্যমত গ্রামাঞ্চলে সংগঠন বাড়াবার চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু এইসব দলগুলির কেউই এতদিন পর্যন্ত গ্রামের খেতমজুর ও গরিব চাষীদের সংগঠিত করে জাগাবার চেষ্টা করেনি বা তাদের আলাদা শ্রেণীসংগঠন গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই করেনি এবং এখনও করছে না। একটু চোখ মেলে লক্ষ্য করলেই আপনারা দেখতে পাবেন, এইসব মেকি মার্কসবাদী পার্টি এবং সোস্যালিস্টরা ঠিক বুর্জোয়া পার্টিগুলির মতোই এবং কংগ্রেসের মতোই গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের ক্ষেত্রে ধনী চাষী ও সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বাবুদের ওপর মূলত নির্ভর করে এবং সেই সমস্ত বাবুদের সাহায্যেই গ্রামের গরিব মানুষদের তাদের নিজ নিজ সংগঠন বা দলের পেছনে টেনে রাখতে চেষ্টা করে। যে দেশে খুব রক্ষণশীল হিসাব ধরলে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা তিপ্পান্ন থেকে পঞ্চান্ন ভাগ লোক হচ্ছে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুর এবং গরিব চাষীদের এর সাথে যোগ করলে যে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় শতকরা আটষট্টি থেকে সত্তর ভাগ, সেই দেশে যে সব দল খেতমজুর ও গরিব চাষীদের আলাদা নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন গড়ে তোলবার কোন চেষ্টা করে না, বরং ঢালাওভাবে ধনী চাষী ও সম্পন্ন চাষী সহ খেতমজুর, গরিব চাষী ও নিম্নমধ্যচাষীদের নিয়ে একত্রে সংগঠনের কথা বলে, তারা শ্রেণীসংগ্রাম, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের বুক্‌নি আওড়ালেও তাদের সত্যিকারের চরিত্র বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

আমাদের দল এস ইউ সি আই কর্তৃক বহুদিন পূর্ব থেকেই খেতমজুর ও গরিব চাষীদের আলাদা নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন হিসাবে কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন গড়ে তোলার পর আজকাল যদিও এদের মধ্যে অনেকেই খেতমজুরদের সংগঠন গড়ে তোলার কথা মাঝে মাঝে বলছেন, তবুও কার্যত এইসব দল এখনও মূলত ধনী চাষী ও সম্পন্ন মধ্যচাষী সহ খেতমজুর ও গরিব চাষীদের একই সংগঠনের মধ্যে অর্থাৎ কৃষক সভা, কৃষক সমিতি প্রভৃতির মধ্যে সংগঠিত করে থাকেন। এর দ্বারা গ্রামীণ সমাজে ধনী চাষী, জোতদার ও সম্পন্ন মধ্যচাষীর সঙ্গে খেতমজুর ও গরিব চাষীর যে নিয়ত শ্রেণীসংগ্রাম বর্তমান, তাকেই অস্বীকার করা হয় এবং কার্যত গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার বদলে শ্রেণী সমন্বয়ের রাস্তা গ্রহণ করা হয়, যার একমাত্র মানে দাঁড়ায় খেতমজুর, গরিব চাষী ও নিম্নমধ্যচাষীর স্বার্থকে ধনী চাষী ও সম্পন্ন মধ্যচাষীর স্বার্থের পায়ে বিসর্জন দেওয়া। এইসব দলের এ ধরনের আচরণের কারণও আছে। এদের মূল রাজনৈতিক লাইন বিচার-বিশ্লেষণ

করলেই আপনারা বুঝবেন যে, মুখে এই দলগুলি যাই বলুক, এদের এই আচরণ এদের মূল রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এরা যে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' এবং 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র কথা বলেন, ধনী চাষীকে সেই উভয় বিপ্লবেরই মিত্রশক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলে, যে সব দল আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ধনী চাষীদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি বলে মনে করে, তারা যে ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের শ্রেণীসংগ্রাম কখনই গড়ে তুলতে পারে না, এ তো অতি সহজ কথা। অথচ বিরাট সংখ্যক গ্রামের খেতমজুর, গরিব চাষী ও নিম্নমধ্যচাষীদের অর্থাৎ গ্রামীণ সর্বহারা ও অর্ধ-সর্বহারাদের উপেক্ষা করে কারোর পক্ষেই আজ আর গ্রামীণ সংগঠন গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। তাই বাস্তব প্রয়োজনেই এইসব দলগুলিকে খেতমজুর ও গরিব চাষীদের কথাও বলতে হয়।

যে গরিব মানুষগুলিকে এতদিন চাবুক ঘুরিয়ে পদানত করে রাখা হয়েছে, সেই মানুষগুলোকে ইজ্জতের সঙ্গে নিজের পায়ে খাড়া করতে বা শ্রেণীসংগ্রামের নীতির ভিত্তিতে এদের আলাদা নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন গড়ে তুলতে এতদিন এরা কেউ এগিয়ে আসেননি এবং বর্তমানেও এরূপ কোন চেষ্টাই তাঁরা করছেন না। গ্রামাঞ্চলে এই গরিব মানুষগুলিকে জাগিয়েছে, ইজ্জতের ওপর দাঁড় করিয়েছে এবং এদের নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন গড়ে তুলেছে এই জেলায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এস ইউ সি আই-ই সর্বপ্রথম — একথা আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা সকলেই জানেন। একমাত্র এস ইউ সি আই-ই এদেশে ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর, গরিব চাষী এবং নিম্ন মধ্যচাষীদের নিয়ে ধনী চাষীদের — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পরিভাষায় যাদের আমরা গ্রামীণ বুর্জোয়া বলি, তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে আলাদা নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলেছে। এর কারণ হচ্ছে ভারতীয় রাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এদেশে জাতীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রশক্তি দখল করেছে। ফলে, এই বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ না করে এদেশে মজুর-চাষীর রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভব নয় এবং শোষিত মানুষের মুক্তিও সম্ভব নয়। আমি আলোচনা করে এটাও আপনাদের দেখিয়েছি যে, আমাদের দেশে যারা বৃহৎ বৃহৎ জমির মালিক, কেন আজ আর তাদের সামন্তপ্রভু বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এরা আজ গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এরাই গ্রামাঞ্চলে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি। এদের বিরুদ্ধে নিয়ত শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা না করে কোনমতেই এদেশে বিপ্লব করা সম্ভব নয়। আপনারা আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন যে, জমির জন্য হোক্, মজুরি বৃদ্ধির জন্য হোক্, ফসলের ন্যায্য ভাগের জন্য হোক্, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হোক্, অথবা নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধেই হোক্, গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন যে সংগ্রামগুলি আপনাদের পরিচালনা করতে হয়, সেগুলি করতে হয় প্রধানত এই সমস্ত ধনী চাষী বা জোতদারদের বিরুদ্ধেই। আর, যখনই ধনী চাষী বা সম্পন্ন মধ্যচাষীর সাথে আপনাদের বিরোধ দেখা দেয় এবং এদের শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হন, তখনই দেখা যায় দেশের সরকার ও তার পুলিশবাহিনী আপনাদের বিরুদ্ধে ধনী চাষী বা সম্পন্ন মধ্যচাষীদের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং দমনপীড়ন চালিয়ে আপনাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে ধনী চাষী বা জোতদাররাই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে বুর্জোয়া শাসন ও শোষণব্যবস্থার শক্ত ঘাঁটি। তাই সবসময়েই তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বুর্জোয়া সরকারের পুলিশবাহিনী সর্বদাই তৈরি রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ধনী চাষী বা জোতদার এবং খেতমজুর ও গরিব চাষী আন্দোলনের বিরোধী সম্পন্ন মধ্যচাষীরা, যাদের আপনারা বাবু সম্প্রদায় বলেন — এরাই হ'ল আপনাদের অর্থাৎ গ্রামীণ সর্বহারা ও অর্ধ-সর্বহারাদের গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশত্রু।

এখন, যদি দেখা যায়, কোন দল নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েও এমন ধরনের চাষী সংগঠন গড়ে তোলে, যে সংগঠনে একই সঙ্গে ধনী চাষী ও সম্পন্ন মধ্যচাষী সহ খেতমজুর, গরিব চাষী ও নিম্নমধ্যচাষী সকলেই সদস্য হতে পারে, তাহলে সেই সংগঠন কার্যত কাদের সংগঠন হয়ে পড়ে? এবং সেই সংগঠনের দ্বারা কাদের স্বার্থ রক্ষা হয়? আপনাদের? না ধনী চাষীদের? আসলে এইসব সংগঠনের প্রধান স্তম্ভ যে ধনী চাষী ও সম্পন্ন মধ্যচাষীরা, তারা পাছে বিগড়ে যায় সেই ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শ্রেণীসংগ্রামই পরিচালনা করা হয় না — একমাত্র খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করা এবং কিছু ফাঁকা গরম গরম বিপ্লবী বুক্‌নি আওড়ানো ছাড়া। আপনারা লক্ষ্য করলেই দেখবেন, সি পি আই, সি পি আই(এম), সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতিটি দলেরই চাষী সংগঠনের চেহারাটা এইরকম। আজ গরিব মানুষগুলো যখন এস ইউ সি আই-এর প্রচেষ্টায় ক্রমেই জেগে উঠছে, তখন তারা দেখছে, এই

গরিব মানুষগুলোকে যে কোন উপায়েই হোক্ যদি তারা তাদের পেছনে টেনে না রাখতে পারে, তাহলে ভোটের রাজনীতিতে তারা আর বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। তাই তারা আজ একমাত্র ভোটের রাজনীতির গরজেই গরিবের বন্ধু সেজে গরিব মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এসেছে এবং এই খেতমজুর ও গরিব চাষীদের নিজেদের সংগঠনের মধ্যে টেনে রাখবার জন্য শুধুমাত্র সরকারের বিরুদ্ধে, ধনী চাষী ও সম্পন্ন মধ্যচাষীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও নয়, বক্তৃতাবাজি করছে এবং খানিকটা ভাসাভাসা ভাবে বড় বড় বিপ্লবের কথা বলছে। আমার এ কথাটা আপনারা সবসময় মনে রাখবেন।

মেকি লালঝান্ডা পার্টিগুলির প্রভাব থেকে জনতাকে মুক্ত করতে হবে

ভারতবর্ষে সাম্যবাদী দল হিসাবে, লালঝান্ডা পার্টি হিসাবে পরিচিত এই সব পার্টিগুলিই আমাদের থেকে অনেক পুরনো পার্টি। কিন্তু এই পার্টিগুলির মধ্যে আজ ক্ষয় ধরেছে। এরা সব আজ বনেদি পার্টিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের সমাজের বনেদি বংশগুলোর মধ্যে যেমন একমাত্র বাইরের ঠাটবাট বজায় রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর সবই যেতে বসেছে এবং যারা আজ পুরোপুরি সমাজে পরগাছায় পরিণত হয়েছে, এইরকম বনেদি বংশের মত রাজনৈতিক আন্দোলনেও কিছু বনেদি পার্টি আছে। তারা কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি নানা লালঝান্ডা পার্টির নামে এবং সোস্যালিস্ট পার্টির নামে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক চাষী আন্দোলনের মধ্যে এদের চরিত্র আজ অনেকটা পূর্বে বর্ণিত বনেদি বংশের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁদের মধ্যে বিপ্লবের ও আদর্শের প্রাণবস্তুটি ছাড়া আর সব ঠাটবাট ঠিকই আছে। তাঁরা কথায় এবং স্লোগানে বিপ্লববাদী, উগ্র আচরণে সর্বক্ষণ কর্মীদের মাতিয়ে রাখার কৌশলটিই আজ তাঁদের একমাত্র সম্বল। এঁরা সকলেই বিপ্লবের কথা বলেন। এঁদের সম্বন্ধে বেশি কথা বলার দরকার নেই। শুধুমাত্র লক্ষ্য করলেই আপনারা দেখতে পাবেন, এইসব মেকি বিপ্লবীদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করা ও বাড়াবার ব্যাপারে জ্ঞান অত্যন্ত টনটনে। একথা ঠিক যে, দু'চারজন ভাল কর্মী সব জায়গাতেই থাকে, তাঁদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাঁদের নেতাদের মধ্যে এবং বেশিরভাগ কর্মীর মধ্যে যাঁরা হোমড়া-চোমড়া, তাঁদের মধ্যে নিজের নিজের সম্পত্তির জ্ঞান এবং পারিবারিক স্বার্থবোধ একেবারে টনটনে। আগে তাঁরা সেইটি রক্ষা করেন তারপর তাঁরা জনগণের মঙ্গল করতে আসেন। এইভাবে তাঁরা জনগণকে ঠকান। আসলে এই পার্টিগুলো জনগণের মধ্যে বিপ্লবের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রেণীশত্রুদের চেয়েও এরা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের বিরোধিতা করতেই বেশি উৎসাহ বোধ করে। এইসব মেকি বিপ্লবী পার্টির প্রভাব থেকে গরিব মানুষগুলোকে মুক্ত করতে না পারলে সফল বিপ্লবের বিরাট আয়োজন দেশে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই এইসব পার্টির চরিত্র দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার করে দিয়ে তাদের বিভ্রান্তির হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করতে হবে।

আপনারা মনে রাখবেন, এ যুদ্ধ একটা মহান যুদ্ধ। এ মাইনে করা সৈন্যদের যুদ্ধ নয়। এ হচ্ছে জীবনপণ করে দেশকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শিল্পকে, কৃষিকে, গ্রামীণ জীবনকে, শহরের জীবনের অধোগতিকে, জাতীয় জীবনের সংস্কৃতিকে, এমনকী বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে পর্যন্ত পুঁজিবাদী জুলুম এবং মুনাফা লুটবার যে চক্কর এবং জাল, তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার বিপ্লব। সেই বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ মজুর-চাষীর ওপর ন্যস্ত। মনে রাখবেন, এ বিপ্লব বাবুরা আপনাদের করে দেবে না। বাবুদের মধ্যে কিছু লোক বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপন শ্রেণীস্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার জন্য আপনাদের মধ্যে এসে আপনাদের জাগাবার চেষ্টা করতে পারে মাত্র। কিন্তু এ বিপ্লব সেদিনই সফল হবে, যেদিন মজুর-চাষীর ঘর থেকে প্রচুর পরিমাণে পার্টির উপযুক্ত বিপ্লবী কর্মী ও নেতা আসবে এবং সেই কর্মীদের নেতৃত্বে শহর ও গ্রামের সমস্ত মজুর-চাষীরা লৌহদৃঢ় সৈন্যবাহিনীর মতো সংগঠিত হবে। তার আগে পর্যন্ত বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে আপনাদের চলতে হবে, বিপ্লবের আয়োজনের জন্য আপনাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে। তার আগে বিপ্লব হবে না, বিপ্লব বহুদূরে থেকে যাবে। আপনারা যেদিন জেগে উঠে প্রতি গ্রামে পার্টির উপযুক্ত নেতা হওয়ার মতো কর্মী এবং শক্তিশালী পার্টি কমিটিগুলো গঠন করে তুলতে পারবেন এবং তাদের অধীনে গ্রামের সমস্ত গরিবরা রাজনৈতিক আদর্শে এবং বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে এক সৈনিক, এক মানুষ, এক দেহের মতো ব্যবহার করতে পারবেন, সেদিন ভারতবর্ষের বিপ্লবকে ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ আর ফৌজ দিয়ে কেউ রুখতে

পারবে না। আমার এই কথাটা অন্তত আপনারা বিশ্বাস করবেন। এই বলেই আজকের মতো আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। আপনারা যাঁরা বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমার বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ এবং লাল সেলাম জানাচ্ছি।

কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই জিন্দাবাদ
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। পরবর্তীকালে সংগঠনের নাম 'কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন'-এর পরিবর্তে 'অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন' করা হয়েছে।

২। বাংলা ১৩৫০ সন, ইংরেজি ১৯৪৩ সাল

৩। সি পি আই (এম)-এর Task on the Peasant Front দ্রষ্টব্য।

৪। সংগঠনের তৎকালীন নাম

৫। বক্তৃতাটি দেওয়া হয় ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যাপসারণের দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

২৯ মার্চ ১৯৭০ প্রদত্ত ভাষণ। ১৯৭০ সালের নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ ঐ ভাষণের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। সেটি এখানে প্রকাশ করা হল।